দ্রৌপদী, রাজনীতিজ্ঞা, বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী, কৌশলময়ী রাজ্ঞী।

মহাকবি ব্যাস রামায়ণের অনুকরণে ঐতিহাসিক ঘটনার সমতা দর্শাইয়াছেন, কিন্তু বাল্মীকি যে উপকরণে সীতা গড়িয়াছেন, তিনি দ্রৌপদী নির্ম্মাণে তাহার একটিও গ্রহণ করেন নাই। কাব্য বৈচিত্রে সামাজিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এই দুইটী প্রধান উপাদান। বাল্মীকির রামায়ণ ত্রেতাযুগের কাণ্ড, তখন কেবল মাত্র আর্য্য সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, রাক্ষস, বানর প্রভৃতি অসভ্যগণ দ্বারা ভারত পরিপূর্ণ। সত্য যুগের আদিম অবস্থা কেবলমাত্র পরিবর্ত্তন হইতেছে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী অতিক্রম করিয়া আর্য্যেরা বিন্ধ্যাচলের উত্তর সীমা ব্যাপিয়া বাস করিতেছেন। এসময় অসুর রাক্ষসে পরিণত হইয়াছে ও কোশল মিথিলা প্রভৃতি নগর সংস্থাপিত হইয়া শাসন প্রণালী ও রাজনীতি আরম্ভ হইয়াছে। এ সময়ে কবির মনের ভাব, সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যে টুকু উন্নত হইয়াছিল, সেই উন্নতির ফল রাম লক্ষ্মণ ও সীতা রামায়ণের নায়ক অধিনায়ক ও নায়িকা। রাম তখন সত্যবাদী, পিতৃ-সত্য পালনে তৎপর ও লোক ভয়ে বিব্রত, সুতরাং এপ্রকার নায়কের নায়িকা, অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূ পতিপরায়ণা, নম্রমুখী নারী-সুলভ-লজ্জা শীলা সীতাই সম্ভব। কিন্তু যখন মহাকবি বেদব্যাস মহাভারত সঙ্কলন করেন, তখন আর সে কাল নাই। তখন সমাজ পরিবর্ত্তিত, তখন আর দস্যু প্রভৃতি স্বতন্ত্র জাতি কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা নাই, আভ্যন্তরিক সংস্করণে সকলেই ব্যস্ত। তখন স্বার্থপর ভারত রাজাদের মধ্যে পরস্পর বিগ্রহ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উদ্দেশ্য অতএব এই বিপ্লবের সময়, কবির, কল্পনার কি লক্ষ্য, তখন ঘোর বিবাদ বিষম্বাদ সঙ্কুল ভারত সমাজের নীতি কৌশল বিশারদ বিস্মার্কের (Bismark) ন্যায় সংস্কারক ও মোল্কের (moltke) ন্যায় সমরশাস্ত্রবিদ্ বীরের প্রয়োজন, অতএব কবি তৎসময়োচিত অভাব পূরণ জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অবতারণা করিয়াছেন। নীতি-কৌশলবেত্তা শ্রীকৃষ্ণ সখা, সমরকুশল গাণ্ডিব ধারী অর্জ্জুনের স্ত্রী, কৃষ্ণা ভিন্ন অন্য কোন রমণী শোভা পায় না। যে মহাভারতে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, অধিনায়ক অর্জ্জুন, সেই মহাভারতে নায়িকা দ্রৌপদী—সেই তেজস্বিনী পাণ্ডবদিগের মন্ত্রিণী দ্রৌপদীর জীবনচরিত পাঠক সমাজের গোচর করিব।

পাঞ্চাল অধিপতি মহারাজ দ্রুপদ আচার্য্য দ্রোণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইলেন। তিনি নিঃসহায়, বলবীর্য্যে দ্রোণাচার্য্য হইতে অপেক্ষাকৃত ন্যূন, দ্রোণের অপমান প্রতিহত চিত্তে সহ্য করিলেন। বল নাই যে অস্ত্রে প্রতি-

বিধান করেন হিন্দুদের শেষ সহায় দৈববল, সুতরাং দেব প্রসাদ আকাঙ্ক্ষী হইয়া, তপ জপ, যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, দেবতা প্রসন্ন হইলেন। হুতাগ্নি হইতে চর্ম্ম বর্ম্ম ও অসিধারী এক পুরুষ উত্থিত হইলেন। ইনি কে? দ্রোণান্তক দৃষ্টদ্যুম্ন। দ্রোণকৃত অপমানের প্রতি বিধাতা পুরুষ উপস্থিত, কিন্তু উপায় কৈ? কবি দ্রোণবধের কারণস্বরূপা, কমনীয়া রূপলাবণ্যসম্পন্না যাজ্ঞসেনীকে সেই পুতাগ্নি হইতে উত্থিত করিলেন। আকাশবাণী হইল "এই কন্যা কাল ক্রমে ক্ষত্রিয় কুল ক্ষয় করিয়া বিস্তর সুকার্য্য সাধন করিবে"। অতএব দ্রৌপদীর সহিত ভারত বিপ্লব জন্মগ্রহণ করিল। এখন দেখা যাউক এই ক্ষত্রিয় কুলক্ষয়কারিণী ভাবী পাণ্ডববধূ ভারত রঙ্গভূমিতে কি চিত্র প্রদর্শন করেন। সীতা হলমুখে উত্থিতা, দ্রৌপদী অগ্নি সম্ভূতা, সীতার জন্ম কালে দ্রৌপদীর ন্যায় আকাশ বাণী হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাগত সাম্য, কিন্তু উদ্দেশ্যের বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে। এক জনের নির্দ্দিষ্ট ও মুখ্য উদ্দেশ্য ক্ষত্রিয় কুল ক্ষয়, দ্রোণাচার্য্য বধ ও বিগ্রহপূরিত ভারত সমাজ সংস্করণ। অন্যের তাদৃশ বিশেষ উদ্দেশ্য কিছুই নাই, রাবণ বধ এক মাত্র গৌণ উদ্দেশ্য অথবা যাগযজ্ঞনাশক বহিঃ শত্রু রাক্ষস কুল হইতে ঋষিকুলকে রক্ষা করা ইহার উদ্দেশ্য বলিলে বলা যায়।

দ্রৌপদী এক্ষণে পূর্ণযৌবনা ও বিবাহযোগ্যা, সাধারণ বিবাহের ন্যায় দ্রৌপদীর বিবাহ সহজে সম্পন্ন হইলে কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। দ্রৌপদীর জীবনের প্রত্যেক ঘটনা সমাজের দৈনিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক, তজ্জন্য কবি পণের আবিষ্কার করিলেন। বাল্মীকি সীতার বিবাহে পণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে পণে ও এ পণে সমাজ ও অবস্থাগত অনেক তারতম্য লক্ষিত হইতেছে। ত্রেতা যুগে বাহুবল ও সামরিক কৌশল যে পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহাতে বীরেরা আপন দৈহিক বলের প্রতি নির্ভর না করিয়া দৈব বল প্রতীক্ষা করিতেন; রামায়ণের কাণ্ড প্রায় সকলই অলৌকিক। রাবণ বধ দৈব বল সাপেক্ষ, রামচন্দ্র অকালে দুর্গা পূজা করিলেন, নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে মেঘনাদ দৈব বলে অবধ্য, যজ্ঞ বিঘ্ন মেঘনাদ বধের কেবল মাত্র উপায় বলিয়া অবলম্বন করা হইয়াছিল। সীতার স্বয়ম্বরও সেই রূপ অলৌকিক ব্যাপার। যে ধনু ভঙ্গ করিতে হইবে, সে ধনু দেবাদিদেব মহাদেবের ধনু, পৃথিবীতে কোন্ বীর সেই দেবধনু ভঙ্গে সমর্থ? সকলেই চেষ্টা করিলেন, সকলেই নিরস্ত হইলেন। জনক রাজা বলিলেন "নির্ব্বীর মুর্ব্বীতলং" পৃথিবী বীরশূন্য! তখন রাম সেই ধনু ভঙ্গ করিলেন? রাম কি ক্ষত্রিয়তেজে কি করিকরবিনিন্দিত বাহুবলে ধনু ভঙ্গ

করিয়াছিলেন, দেবধনু ভঙ্গ করা কি মনুষ্যের সাধ্য? তবে রাম কিসে ধনু ভঙ্গ করিলেন? রাম অমানুষ, মায়া দেহধারী মানব, বিষ্ণুর অবতার, রাম দেবতা! কিন্তু দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর অলৌকিক ব্যাপার নহে। মহাভারত যে সময় রচিত, তখন ধনুর্ব্বিদ্যা যুদ্ধকৌশল রামায়ণের সময় অপেক্ষা অনেক উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত, তখন লোকেরা দৈব বলের প্রতি তত নির্ভর করে না। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যে লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে, তাহাতে কোন দেবতার অধিকার নাই, মনুষ্যের রচিত লক্ষ্য মনুষ্যেই ভেদ করিবে এ জন্য তথায় ধনুর্বিদ্যার যথার্থ পরিচয়, এবং নীতিকৌশলা বুদ্ধিমতী ভারত রাজ্ঞীর উপযুক্ত পাত্রের জন্য অবতারের প্রয়োজন নাই, কবি সেই জন্যেই ধনুর্বিদ্যা-বিশারদ, সমরকুশল মহাবীর অর্জ্জুনের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সভাস্থল ঋষি, রাজন্যগণ ও ব্রাহ্মণ মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ। একদিকে বস্ত্রালঙ্কার-সুশোভিতা শরদিন্দুনিভাননা দ্রৌপদী পুষ্পমালা হস্তে দণ্ডায়মানা। তুমুল ব্যাপার, শ্রবণ বধির ঘোর কোলাহল, কোন্ মহাবীর লক্ষ্য ভেদ করিয়া এমম্বিধ রমণীরত্ন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইবেন। ভারতসম্রাট মহারাজ দুর্য্যোধন সবলে উপস্থিত, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ধনুর্দ্ধারণে তাঁহার অধিকার। তিনি ধনুর্ব্বাণ হস্তে অগ্রসর হইলেন, লক্ষ্য ভেদে অপারগ হইয়া নিরস্ত হইলেন। মহাবীর ভীষ্মকে লক্ষ্যভেদে অক্ষম করিয়া অবমাননা করা কবির উদ্দেশ্য নহে, মহাভারতের বিশুদ্ধচরিত্র বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের বারত্বে দোষারোপ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, এজন্য কবি নপুংসক শিখণ্ডিকে উপস্থিত করিলেন, শাস্ত্রবিদ্ ধার্ম্মিক ভীষ্মদেব, অমঙ্গল দর্শন করিয়া ধনুর্বাণ ত্যাগ করিলেন। কর্ণ পিতামহকে নিরস্ত দেখিয়া শর সন্ধান করিলেন। কুরু ও পাণ্ডব দলে বাল্যাবধি কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতি দ্বন্দ্বী। লক্ষ্যভেদে অপারগ করিয়া কর্ণকে বীরত্বে লাঘব করিলে অর্জ্জুনের গৌরবের লাঘব করা হয়, এজন্য কর্ণকে বীর বলিয়া পরিচয় দেওয়া ও লক্ষ্য ভেদে বিরত করা, কবির এই দুই কল্পনা একটী উপায় দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে, সভামণ্ডপে নির্ভীকচেতা দ্রৌপদী বলিলেন "আমি সূতপুত্রকে পতিত্বে বরণ করিব না"। চারিদিকে লোকে চমৎকৃত হইল। কর্ণ ম্লানবদনে ভগ্নোদ্যম হইলেন। ক্রমে সকল রাজা ও ক্ষত্রিয় পরাস্ত হইয়া মন্ত্রাহত আশীবিষের ন্যায় নতশিরে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন। সভাস্থল নিস্তব্ধ, সকলেই নিশ্চেষ্ট ও ম্রিয়মান, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন দণ্ডায়মান হইয়া তারঃস্বরে বলিলেন "কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য যে কেহ এই লক্ষ্য ভেদ করিবেন, তিনি আমার ভগ্নী যাজ্ঞসেনীর বরমাল্য লাভে সমর্থ হইবেন"। এই কথা শেষ হইবামাত্র সেই বিরাট সভার এক

পার্শ্ব হইতে একটি কৃষ্ণকেশ মলিন বেশ দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার ধনুর্ব্বাণ হস্তে অগ্রসর হইলেন। কেহ উপেক্ষা, কেহ বিদ্রূপ, কেহ এই যুবা পুরুষের অসম সাহসকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। যুবক অটল পর্ব্বতের ন্যায় নির্ভরহৃদয়ে কার্ম্মুকে জ্যারোপ করিয়া অভ্রান্ত শর সন্ধান করিলেন। যখন অঙ্গরাজ কর্ণ লক্ষ্য ভেদ করিতে উঠিয়াছিলেন, তখন দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন যে আমি সূত-পুত্রকে পতিত্বে বরণ করিব না, কিন্তু যখন এই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ লক্ষ্য ভেদ মানসে শর সন্ধান করিলেন, তখন কোন কথাই বলিলেন না। এ মৌনের কি কোন তাৎপর্য্য নাই? অঙ্গরাজ কৃতকার্য্য হইলে তিনি অঙ্গদেশের রাজ্ঞী হইতেন, তিনি তাহা উপেক্ষা করিলেন এবং অঙ্গরাজ্যের রাজেশ্বরী হওয়া ঘৃণিত বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু উচ্চবর্ণ বীর ভিখারীর নারী হইতে একটুও কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি কি জানিয়াছিলেন যে এই যুবক ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায়, ব্রাহ্মণ বেশধারী বীর পার্থ? না—তিনি জানিতেন না। তবে কৃষ্ণার এ ভাবের কারণ কি? কারণ কেবল দ্রৌপদীর স্বভাব। দ্রৌপদী উন্নতমনা তেজস্বিনী আর্য্যরমণী, তিনি বরং বীরের রমণী হইয়া ভিখারিণী হইবেন, তবুও নীচ কুলে গৃহীতা হইয়া ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বরী হইতে ইচ্ছা করেন না। দ্রৌপদীর এই উন্নত মনোবৃত্তি রমণী কুলের আদর্শ স্বরূপ।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

(২৫৮ সংখ্যার ৯৪ পৃষ্ঠার পর)

৯৫ * কত ধানে কত চাল!

৯৬ কত সাধ যায় রে চিতে।
মলের আগে চুটকী দিতে।

৯৭ কথায় চিড়ে ভিজে না।

৯৮ কনের মা কাঁদে,
আর টাকার পুঁটুলী বাঁধে।

৯৯ কপাল সঙ্গে সঙ্গে যায়।

১০০ কপালে নাইকো ঘি,
ঠক ঠকালে হবে কি?

১০১ কর্ম্মে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে,
বচনে থান পুড়রে।

১০২ কাক খায় সকলের মাস,
কাকের মাস কেউ খায় না।

১০৩ কাকের বাসায় কোকিলের ছা।

* প্রথমবারে অকারাদি ১৯ টী প্রবচন যায়, তাহার সংখ্যা গত বারে ধরা হয় নাই।

১০৪ কাঙালের ঘোড়া রোগ।

১০৫ কাঙালের মরণ বিট্‌কেল।

১০৬ কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখান।

১০৭ কাঁচা মাটীতে পা দেওয়া।

১০৮ কাজির কাছে হিঁদুর পার্ব্বণ।

১০৯ কাজ সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি।

১১০ কাজের সময় কাজী,
কাজ ফুরালে পাজী।

১১১ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

১১১॥ কাট বিড়ালের সাগর বাঁধা।

১১২ কাট্‌লেও রক্ত নাই,
কুটলেও মাংস নাই।

১১৩ কাঁটালের আমসত্ব।

১১৪ কাঠের ভিতর পিঁপড়ে বলে
চিনি নইলে খাব নি,
চিন্তা করে চিন্তামণি যোগান অমনি

১১৫ কাণ চায় সোণারে,
সোণা চায় কাণেরে।

১১৬ কান নে গেল কাকে ত
কাকের পাছে পাছে ছোট।

১১৭ কাণাগোরুর ভিন্ন গোঠ।

১১৮ কাণা গোরু বামনকে দান।

১১৯ কাণা মেঘের বৃষ্টি।

১২০ কাণার বেটা পদ্মলোচন।

১২১ কাণা খোঁড়ার একগুণ বাড়া।

১২২ কাণ টানিলে মাথা আসে।

১২৩ কামারের কুমোর বৃত্তি।

১২৪ কায়েতের ছোট বেদের বড়।

১২৫ কায়েতের মূর্খ কলুর বলদ।

১২৭ কায়েতের হাড়া,
বেগুণের খাড়া।

১২৬ কার শ্রাদ্ধ কেবা করে,
খোলা কেটে বামন মরে।

১২৮ কারুর ঘর পোড়ে, কেউ ধোঁয়া খায়।

১২৯ কারু দুধে চিনি, কারু শাকে বালি।

১৩০ কারুর সর্ব্বনাশ, কারুর পৌষমাস।

১৩১ কালনেমির লঙ্কা ভাগ।

১৩২ কালা শুনে ঢাকের বাদ্যি,
কালা বলে মোর বের বাদ্যি।

১৩৩ কালি রাম রাজা হবে, আজি
বনবাস।

১৩৪ কালে বাণু পণ্ডিত হবে।

১৩৫ কাশীতে ভূমিকম্প।

১৩৬ কিন্‌তে ছাগল বেচতে পাগল।

১৩৭ কিল খেয়ে কিল চুরী।

১৩৮ কিসের নাই কি, বেগুণপোড়ায় ঘি।

১৩৯ কিসের মাসি, কিসের পিসি
কিসের বৃন্দাবন,
মরাগাছে ফুল ফুটেছে মা বড় ধন।

১৪০ কিবা মেয়ের ছ্যারী
বাঁশবনের প্যারী।

১৪১ কুকুরকে নাই দিলে কাঁদে উঠে।

১৪২ কুকুরের হলো ঘি পত্তি,
কুকুর বলে এ কি বিপত্তি।

১৪৩ কুঁড়েরে বলে কুঁড়ে,
আমি ঘুমুই তুই উঠে দোর তাড়া দে।

১৪৪ কুঁড়েরে কুঁড়ে বায় বয়; না
দোরটা দিলে ভাল হয়।

১৪৫ কুঁড়ে গরু অমবস্যা খোঁজে।

১৪৬ কুঁদোর মুখে বেঁক থাকে না।

১৪৭ কৃপণের ধন।

১৪৮ কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে।

১৪৯ কেউ মরে বিল ছেঁচে
কেউ খায় কৈ।
১৫০ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুলো।
১৫১ কেঁদে জেতা।
১৫২ কোন্ কালে হবে পো
নেকড়া কানি তুলে থো।

একান্নবর্ত্তিতা।

একান্নবর্ত্তিতা হিন্দু সমাজের একটি চিরপ্রসিদ্ধ লক্ষণ; কিন্তু দিন দিন ইহা উঠিয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে ইহার অদৃষ্টে কি আছে তাহা এক্ষণে স্থির করা অবশ্য সহজ নহে; কিন্তু ইহার বর্ত্তমান অবস্থা বড় আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি।

(১) আমাদের মধ্যে ইউরোপীয় ভাব ও ইউরোপীয় রীতি নীতি অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। ইউরোপীয় সমাজে একান্নবর্ত্তিতা লক্ষিত হয় না; সুতরাং ইউরোপীয়দিগের অনুকরণকারী হিন্দুসমাজেও একান্নবর্ত্তিতার প্রতি লোকের আর পূর্ব্বের মত আস্থা নাই।

(২) পাঁচজনের সহিত একত্রে থাকিতে হইলে অনেক সময় তাহাদের ভার বহন করিতে হয়। কিন্তু আজ কাল যেরূপ কঠিন দিন পড়িয়াছে, তাহাতে লোকে নিজের দায়েতেই বিব্রত। এরূপ অবস্থায় একান্নবর্ত্তিতা কোন ক্রমেই অব্যাহত থাকিতে পারে না।

(৩) আমাদের স্বার্থপরতা ইহার অন্যতম কারণ। আমরা স্বীকার করি আর না করি, ইহা নিশ্চয় যে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে স্বার্থপরতার প্রাদুর্ভাবটা কিছু বেশি হইয়াছে। স্বার্থপর ব্যক্তি অপরকে ত্যাগ করিয়া আপনি পৃথক্ থাকিতে স্বভাবতঃ ভালবাসে। সুতরাং এ অবস্থায় একান্নবর্ত্তিতার অবশ্যই উচ্ছেদ হইবে।

উল্লিখিত কারণগুলি বশতঃ হিন্দুসমাজ মধ্যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক একান্নবর্ত্তিতার দোষ গুণ কি। সভ্যসমাজ মধ্যে এমন একটি রীতি সহজে খুঁজিয়া পাওয়া ভার যাহা একেবারে নির্গুণ। সুতরাং একান্নবর্ত্তিতার মধ্যে বহু দোষ থাকিলেও ইহার অবশ্য কিছু না কিছু গুণ থাকিবার কথা। আমরা প্রথমে ইহার গুণগুলির বিষয় বলিয়া পরে ইহার দোষগুলি দেখাইব।

কিরূপে স্বল্প ব্যয়ে সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারা যায়, ইহা সংসারাশ্রমের একটি অতি কঠিন প্রশ্ন।

একান্নবর্ত্তিতাতে এই প্রশ্নের অনেকটা মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি একান্নবর্ত্তী পরিবার পৃথক্ হইয়া দুই বা ততোধিক পরিবারে বিভক্ত হইলে তাহাদিগকে যত ব্যয় ভার বহন করিতে হয়, একান্নবর্ত্তিতাবস্থায় তাহার অপেক্ষা অনেক স্বল্প ব্যয়ে তাহাদের চলিতে পারে। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে যে দুইটি ভ্রাতা একান্নবর্ত্তী থাকিয়া যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতায় দিন যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, পৃথক্ হইবার পরে কিছুতেই সেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতার অধিকারী হইতে পারিলেন না। যাঁহাদের অর্থের অভাব নাই, তাঁহারা এই তর্কটি উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকদিগের পক্ষে ইহা কিছুতেই উপেক্ষণীয় বলিয়া বোধ হয় না।

একান্নবর্ত্তিতার পক্ষে আর একটি তর্ক আছে। বাল্যকাল হইতে আমরা যাঁহাদের সহিত একত্রে আহার করিয়াছি, এক শয্যায় শয়ন করিয়াছি, তাঁহাদের অহিত সদ্ভাব যাহাতে চিরকাল বদ্ধমূল থাকে তাহা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে পৃথক্ অন্নে সেরূপ আত্মীয়তা কিছুতেই থাকিতে পারে না। 'ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী' এ কথাটির ভিতরে অনেক অর্থ আছে। দুইটি ভ্রাতা পৃথক্ থাকিলে তাহাদের ভ্রাতৃভাব দিন দিন অবশ্যই কমিয়া যাইবে, এবং অবশেষে তাহারা নিশ্চয়ই দুর সম্পর্কীয় জ্ঞাতিতে পরিণত হইবে। জগতে ভ্রাতৃভাবের যত বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। সুতরাং যদ্দ্বারা ভ্রাতৃভাব পরিবর্দ্ধিত না হইয়া তিরোহিত হয়, তাহা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয় না। *

একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইলে পাঁচজনের সহিত একত্রে বাস করিতে হয়। সুতরাং নিজের স্ত্রী পুত্রের সুখ ব্যতীত আর পাঁচজনের জন্য চিন্তা করিতে আমরা অভ্যস্ত হই। এই কারণবশতঃ একান্নবর্ত্তী পরিবার নৈতিক শিক্ষার্থ একটি অতি উৎকৃষ্টস্থল।

একান্নবর্ত্তিতার যেমন গুণ আছে, তেমন আবার অনেকগুলি দোষও আছে। নিম্নে সেগুলি একে একে দেখাইতেছি।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তৃত্ব ভার প্রায়ই একজনের উপর ন্যস্ত হয়; সুতরাং আর পাঁচজনে সংসার কার্য্যের কিছুই শিখেন না। বিশেষতঃ পরিবারটির আয় পৈতৃক বিষয় হইতে উৎপন্ন হইলে তাঁহারা কেবল আলস্যে কাল যাপন করেন। কিন্তু এই দোষটির হস্ত হইতে অনায়াসে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। সংসারের প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে কোন না

* এই তর্কটির বিরুদ্ধে যাহা বলা যাইতে পারে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কোন কার্য্যের ভার লইতে হইবে, এরূপ নিয়ম অতি সহজেই করিতে পারা যায়।

একান্নবর্ত্তি পরিবারের আর একটি মহা দোষ এই যে অনেক স্থলে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ একজনের উপর নির্ভর করে বলিয়া আপনারা উপার্জ্জনক্ষম হইবার চেষ্টা করে না। ইহাতে তাহাদের নিজের নৈতিক ও মানসিক অমঙ্গল হয়, এবং এক ব্যক্তিকে অকারণে অনেকের ভার বহন করিতে হয়। এরূপ স্থলে একান্নবর্ত্তিতা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু যাহারা সকলেই অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন, এবং যাঁহাদের আয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাঁহাদের পক্ষে এ আপত্তিটি খাটিতে পারে না। যেস্থলে একজনের ঘাড়ের উপর দিয়া পাঁচজনে চালাইব এরূপ সংকল্প থাকে, অথবা পাঁচজনের মধ্যে দুই একজনের আয় আর সকলের অপেক্ষা বিস্তর অধিক, সেখানে একান্নবর্ত্তিতা প্রায়ই অধিক দিন থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে একান্নবর্ত্তিতার দ্বারা সদ্ভাব বদ্ধমূল হয়। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে এতদ্দ্বারা যেমন সদ্ভাব বৃদ্ধি পাইতে পারে, তেমন আবার অনেক সময়ে ইহা হইতে বড়ই বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমে অতি সামান্য বিষয় লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় অসদ্ভাব উপস্থিত হয়, এবং অবশেষে ভ্রাতৃভাবের পরিবর্ত্তে অতি ভয়ানক শত্রুতা তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করে। বস্তুতঃ এই জন্যই অনেক উৎকৃষ্ট ব্যক্তি একান্নবর্ত্তিতার পরম বিরোধী। যাহাতে এমন অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার প্রতি পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত। অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে যে এ দোষটি একান্নবর্ত্তিতার নহে। ইহা আমাদের নিজের দোষ। পাঁচ জনের ও নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া পরিশ্রম করিব, এ শিক্ষা আমাদের নাই বলিয়া একান্নবর্ত্তিতা হইতে এই বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। সুতরাং আমরা চেষ্টা করিলে এই অমঙ্গলটি অতিক্রম করিয়া একান্নবর্ত্তিতার শুভ ফলগুলি উপভোগে সক্ষম হইতে পারি।

একান্নবর্ত্তিতা বাঞ্ছনীয় কি না তাহা আমরা বলিতে চাহি না। ইহার দোষ ও গুণ উভয়ই দেখাইলাম। এক্ষণে পাঠিকাবর্গ আপনারা বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

স্ত্রীজাতি ও শিল্পকার্য্য।

পুরুষেরা যেরূপ বিষয় বিশেষের অনুশীলনে আত্মোৎসর্গ করিয়া পরিশেষে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, স্ত্রী লোকেরা যতদিন পর্য্যন্ত না সেইরূপ অনুশীলনে শিক্ষিতা হন, ততদিন তাঁহারা পুরুষদিগের ন্যায় সমাজ মধ্যে গণনীয় হইতে পারিবেন না। স্ত্রী, মাতা, গৃহিণী, সামাজিকা, পরিচ্ছদ প্রস্তুত কারিণী পাচিকা ধাত্রী, ছাত্রী, চিত্রকারিণী প্রভৃতি যে বিষয়ে যিনি দক্ষতা লাভ করিতে চাহেন, তাহাকে সেই বিষয়ের অনুশীলনে জীবন পণ করিতে হইবে, নতুবা তাঁহা হইতে কোন মহৎ কার্য্যের সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীলোকেরা অভ্যাস বশতঃ/প্রায় অস্থির-চিত্ত, এক বিষয়ের অনুশীলনে তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। একটু শিল্পকার্য্য, একটু লেখাপড়া শিক্ষা, একটু গৃহকার্য্য, একবার এক বিষয়ে অনুশীলন এবং পর ক্ষণে ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, এই করিয়া তাঁহারা সমস্ত শ্রম ও কার্য্য পণ্ড করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের হইতে সংসারে, কোন মহৎকার্য্য প্রায়ই সম্পন্ন হয় না। "স্ত্রীলোকের হস্তে কার্য্য সমর্পণ পণ্ডশ্রমের উদাহরণ স্বরূপ" ইহা আমাদিগের একটী সমাচীন প্রবচন। লীলাবতী, বা খনা গার্গীর ন্যায় হইতে অভিলাষী হইলে তাঁহাদিগের ন্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়া অভিলষিত বিষয়ের অনুধাবন করিতে হইবে।

শিল্পবিদ্যা স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ হইতে পারে কারণ ইহার অনুশীলনে অনেককেই স্বতঃ প্রধাবিত হইতে দেখা যায়, তথাপি কেন, তাঁহারা ইহার উৎকর্ষসাধনে সমর্থ নন? এই প্রশ্নের উত্তর কেবল ইহাই হইতেপারে যে তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়া বিশেষ অনুশীলন করেন না, যাঁহারা ইহা করিতে পারিয়াছেন তাহারা তাহার উৎকর্ষ সাধনও করিয়াছেন। রোজাবনহর, (Rosa Bonheur), এলিজেবেথ বটলার (Elizabeth Butler) কুমারী এলিজেবেথ ষ্ট্রং (Elizabeth Strong) প্রভৃতি মহিলারা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

অনেকে অনুমান করেন উদ্বাহ বন্ধন স্ত্রীজাতির উন্নতির অন্তরায়। অপরিণীত অবস্থায় যেরূপ আগ্রহের সহিত বিষয় বিশেষের অনুশীলনে প্রবৃত্তি হয়, পরিণীত অবস্থায় সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য অনেক সময় বিষয়ান্তরে সময় অপব্যয় করিতে হয়। যাঁহারা এরূপ অনুমান করেন, তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিতা। বরঞ্চ এরূপও দেখা গিয়াছে যে অনেক স্বামী স্ত্রীর গুণের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে জীবন পর্য্যন্ত পণ

করিয়াছেন, জর্জ্জ ইলিয়ট (George Eliot) ইহার প্রমাণ। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হইয়া তাঁহার অবলম্বিত বিষয়ের আলোচনাদি করিয়া থাকেন, এতদর্থে অনেক সময় তাঁহাকে নিজ অবলম্বিত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অনভিলষিত ও অপ্রীতিকর বিষয়েরও অনুশীলন করিতে হয়, সুতরাং স্বামীর সাহায্যার্থ তাঁহাকে নিজরুচির পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সংসারের হিতকল্পে এরূপ কার্য্য কল্যাণকর ও বুদ্ধিমতীর কার্য্য বটে, তথাপি কোন বিষয়ের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছুক হইলে স্বামীর রুচিও উপেক্ষা করিতে হইবে। গৃহিণী ও পতিপ্রাণা স্ত্রীদিগের এবিষয়ে ওজর থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল স্ত্রী স্বামীর সাহায্য করেন না অথচ নানা বিষয়ে প্রধাবিতচিত্ত হন—তাঁহাদিগের আপত্তি কি? কুমারী অবস্থায় শিল্প কার্য্য, পরিণীত অবস্থায় শাস্ত্রানুশীলন, —এবং প্রৌঢ়াবস্থায় গৃহকার্য্য—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের অনুশীলনে কোন কার্য্যই সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না।

তারকা।

মেঘমুক্ত, জ্যোৎস্নাবিহীন শারদীয় নৈশ গগনে অগণ্য হীরকখণ্ডসদৃশ নক্ষত্র রাজি দর্শন করিয়া কাহার হৃদয় না আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে? আবার যখন বিজ্ঞানের প্রসাদে আমরা জানিতে পারি যে, উহারা দেখিতে ক্ষুদ্র হীরক খণ্ডের ন্যায় হইলেও, উহাদের অধিকাংশই আমাদের এই পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ বৃহৎ, তখন ঐ আনন্দ বিস্ময়ে পরিণত হইয়া আমাদিগকে একেবারে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলে। এই জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর মধ্যে অল্পসংখ্যক কয়েকটী সৌর জগতের গ্রহমাত্র। তাহাদের মধ্যে কোন কোনটী পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর হইলেও, নক্ষত্রের তুলনায় তাহারা অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি। আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহগুলিও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। নক্ষত্রেরও গতি আছে। কিন্তু উহারা পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে, আমাদের চক্ষে উহাদিগকে স্থির বলিয়াই বোধ হয়। সহস্র সহস্র বৎসরেও উহাদের অবস্থানের বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। গ্রহগণের সম্বন্ধে অন্যরূপ। দিন কতক একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই উহাদের গতি বেশ

বুঝিতে পারা যায়। আজি শুক তারাকে (শুক্র) যে সকল নক্ষত্রের নিকট অবস্থিত দেখিবে, কিছু দিন পরে আর উহাকে তাহাদের নিকট দেখিতে পাইবে না। আমরা প্রথমে গ্রহগণের আকার, দূরত্ব ও গতি সম্বন্ধে দুই চারিটী জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া তাহার পর নক্ষত্রের দূরত্ব ও অবস্থাদির বিষয় বর্ণন করিব।

সৌরজগতে সর্ব্বশুদ্ধ আটটী গ্রহ আছে। উহারা অনবরত বৃত্তাভাস (বাদামে) পথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য হইতে উহাদের যেটী যতদুরে অবস্থিত, তদনুসারে উহাদের নাম এই,—বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী, মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনস্ (Uranus) নেপ্‌চুন্ (Neptune)।

মঙ্গল ও বৃহস্পতির ভ্রমণ পথের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে, তাহাদের নাম এষ্টারয়েড্‌স (Asteroids) ক্ষুদ্র তারা বা প্লানেটয়েড্‌স (Planetoids) ক্ষুদ্র গ্রহ। ১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ইহাদের প্রায় এক শত ত্রিশটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ গুলি কোন গ্রহবিশেষের ভগ্নাবশেষ মাত্র।

গ্রহগণের চতুর্দ্দিকে যে সকল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জড়পিণ্ড সকল ভ্রমণ করিতেছে, তাহারা উপগ্রহ বা চন্দ্র নামে আখ্যাত। কোন কোন গ্রহের একাধিক চন্দ্র আছে। কাহার কয়টী চন্দ্র, তাহা ক্রমে ক্রমে বলা হইবে।

ধূমকেতুও একপ্রকারের গ্রহ। কিন্তু উহাদের ভ্রমণ পথ গ্রহগণের ভ্রমণ পথ অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি।

আমাদের সূর্য্য ও তাহাকে মধ্য বিন্দু করিয়া যে সকল গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু গগনপথে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের সমবায়ের নাম সৌরজগৎ।

১। গ্রহগণের মধ্যে বুধ (Mercury) অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা সূর্য্যের নিকটতর। তথাপি ইহা সূর্য্য হইতে সাড়ে তিনকোটী মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার আকারও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহা আমাদের চন্দ্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে এবং সূর্য্যাস্তের পর কিয়ৎ কাল মাত্র পৃথিবী হইতে বুধ গ্রহ নয়নগোচর হয়। আমাদেম ৮৪ দিনে বুধের এক বৎসর অর্থাৎ এই ৮৪ দিনের মধ্যে বুধ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিয়া আইসে।

২। বুধের পরই শুক্র (venus) বা শুক তারা। সূর্য্যহইতে ইহার দূরত্ব ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মাইল। ইহা আকৃতিতে প্রায় আমাদের পৃথিবীর মত। গগন পথে ভ্রমণ কালে ইহা অন্য গ্রহ অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটে আসে বলিয়া আমাদের চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দেখায়। বুধের ন্যায় শুক্রও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অথবা সূর্য্যাস্তের পর পৃথিবী হইতে দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু ইহাকে বুধের অপেক্ষা

অধিক ক্ষণ দেখা যায়। উদয়কালের পরিবর্ত্তন অনুসারে এই একই গ্রহ কখনও সায়ংকালে এবং কখনও প্রত্যূষে আমাদের দৃষ্টি পথের পথিক হয়। আমাদের ২২৪ দিনে শুক্রের এক বৎসর অর্থাৎ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিয়া আসিতে শুক্রের ২২৪ দিন লাগে।

পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যপথে অবস্থিত বলিয়া কখনও বা বুধ, কখনও বা শুক্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থিত হয়। তখন ইহাদের প্রত্যেককে সূর্য্যের উপর একটী কাল দাগের মত দেখায়। ইহাকে বুধ বা শুক্রের (transit) অতিক্রমণ বলে।

৩। পৃথিবী সূর্য্য হইতে প্রায় নয় কোটি কুড়ি লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। আটটী প্রধান গ্রহের মধ্যে পৃথিবী আকৃতিতে পঞ্চম স্থানীয় অর্থাৎ উহাদের চারিটী পৃথিবী অপেক্ষা বড় এবং তিনটী পৃথিবী অপেক্ষা ছোট। একটী কমলালেবুর তুলনায় শাদা মটর যত বড়, বৃহস্পতির তুলনায় পৃথিবী তত বড় এবং এই হিসাবে বুধ একটী সরিষার মত। পৃথিবীর ব্যাস ৭৯১২ মাইল এবং পরিধি ২৪,৮৫৬ মাইল। যদি একখানি রেলগাড়ি ঘণ্টায় ক্রমাগত ৪০ মাইল করিয়া চলে, তবে সমস্ত পৃথিবী বেষ্টন করিতে উহার প্রায় ২৬ দিন লাগিবে। পৃথিবীর উপগ্রহ বা চন্দ্রের সংখ্যা একটী। পৃথিবী যদি একস্থানে স্থির থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র ২৭৷৷০ দিনে, উহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আসিতে পারিত। কিন্তু পৃথিবীর স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য এই আবর্ত্তন প্রায় ২৯৷৷০ দিনে সম্পাদিত হয়। এই জন্য সৌর মাস অর্থাৎ পৃথিবীর সাংবৎসরিক গতি ধরিয়া যে মাস গণনা করা হয়, তাহার ও চন্দ্রমাসের সামঞ্জস্য থাকে না। প্রতি বৎসরে সৌরমাসে ও চান্দ্রমাসে প্রায় দশ এগার দিন অগ্র পশ্চাৎ হইয়া পড়ে। এ বৎসর যদি ৩২এ আষাঢ় পূর্ণিমা হইয়া থাকে, তবে আগামী বৎসর ২১এ আষাঢ় নাগাইদ, তৎপর বৎসর ১০ই আষাঢ় নাগাইদ এবং তাহার পর বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে পূর্ণিমা হইবে। এই জন্য তিথি অনুসারে যে সকল পার্ব্বণ হয়, তাহা প্রতি বৎসর এক সময়ে হয় না। গত বৎসর যে তারিখে দুর্গাপূজা হইয়া গিয়াছে,এ বৎসর তাহায় প্রায় দশ এগার দিন পূর্ব্বে হইবে, পর বৎসর আরও দশ এগার দিন পূর্ব্বে হইবে। ক্রমাগত এইরূপ হইলে দুর্গাপূজা, দোল প্রভৃতি হিন্দু পূজা সকল মুসলমানদের পার্ব্বণের ন্যায় বৎসরের সকল সময়েই হইতে পারিত। সৌর ও চান্দ্রমাসের অসামঞ্জস্যের প্রতিবিধানের জন্য হিন্দুগণ পঞ্জিকা গণনার সময় প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটী করিয়া চান্দ্রমাস বাদ দিয়া হিসাব করেন। যে বারে দুই সংক্রান্তির মধ্যে দুইটী অমাবস্যা পড়ে, সেই বারে চান্দ্রমাসটী 'মলমাস' বলিয়া ত্যাগ করা হয়; সে মাসের পূজাদি শুভকর্ম্ম তাহার

পরবর্ত্তী চান্দ্রমাসে সম্পাদিত হয়। হিন্দুগণ এইরূপে সৌর ও চান্দ্রমাসের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু মুসলমান পঞ্জিকাকারগণ চান্দ্রমাস ধরিয়া বৎসর গণনা করেন বলিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের মহরম প্রভৃতি পর্ব্ব কখনও শীতকালে, কখনও গ্রীষ্মকালে, কখনও বা পূজার সময় হইয়া থাকে। ইহাদের পার্ব্বণ সকল সৌর বৎসর অনুসারে প্রতি বর্ষে এগার দিন এবং প্রতি তিন বৎসরে প্রায় এক মাস সরিয়া যায়।

চন্দ্র যখন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে, তখন উহার একই দিক সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া থাকে। সুতরাং যে সময়ের মধ্যে চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিয়া আসে, সেই সময়ের মধ্যে উহার সমস্ত অংশ এক-বার না একবার সূর্য্যের দিকে ফিরে, অর্থাৎ যত দিনে আমাদের এক চান্দ্রমাস হয়, তত দিনে চন্দ্রে একবার দিনরাত্রি হয়। চন্দ্রের যে অর্দ্ধভাগ সর্ব্বদা পৃথি-বীর দিকে ফিরিয়া থাকে, পূর্ণিমার দিন তাহা সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যালোকে আলো-কিত হয় এবং অমাবস্যার দিন চন্দ্রের অপর অর্দ্ধাংশ সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া থাকে। মনে কর তুমি একটী উজ্জ্বল আলোকের দিকে সম্মুখ করিয়া বসিয়া আছ, এমন সময় যদি কেহ তোমার ও আলোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া এমন ভাবে তোমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে যে তাহার মুখ বরাবর তোমারই শরীরের দিকে ফিরিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি যখন তোমার ও আলোকের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন কেবল তাহার শরীরের পশ্চাদ্ভাগ আলোকিত হইবে এবং সে যখন তোমার পশ্চাতে আসিবে তখন তাহার সম্মুখের দিকে আলোক পড়িবে। সে যখন আবার ঐ ভাবে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিবে, তখন ঐ আলোকটী আবার তাহার পশ্চাতে পড়িবে। সুতরাং একবার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণের মধ্যে উহার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ একবার করিয়া আলোকের সম্মুখে পড়িবে। এখন মনে কর ঐ আলোক সূর্য্য, তুমি পৃথিবী, আর যে তোমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে সে চন্দ্র, তাহা হইলেই চন্দ্র যে ভাবে পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছে ও যতদিনে চন্দ্রের একবার দিবারাত্রি হয়, তাহা বুঝিতে পারিবে।

অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ অপেক্ষা পৃথিবী ও চন্দ্রের সহিত আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে এত কথা বলা গেল।

নিত্য পঞ্জিকা।

ভাদ্র।

১। গঙ্গা ভরা, একটানা, এমন সুযোগ আর পাইবে না, নৌকা ছাড়িয়া দেও।

২। তরী ভাসিয়াছে, আনন্দে দাঁড় বাহিয়া চল, মাঝীর মুখের দিকে চাও, উৎসাহ ও বল বৃদ্ধি হইবে।

৩। অনুকূল বায়ু বহিলে পাল তুলিয়া দেও, কিন্তু বায়ু না বহিলে দাঁড় বাহিতে ছাড়িও না। পাল প্রস্তুত করিয়া রাখ বায়ু কখন বহিবে জান না। প্রার্থনা ও আত্মচেষ্টা উভয়ই আবশ্যক।

৪। অজ্ঞ লোকে মনে করে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র মেঘাচ্ছন্ন, তাই তাহাদিগকে দেখা যাইতেছে না। নির্ব্বোধ মানুষ! ঘনাচ্ছন্ন আকাশ, না ঘনাচ্ছন্ন তোমার চক্ষু?

৫। রাসায়নিক একটী ক্ষুদ্র ঘরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকরণ লইয়া বাষ্পকে জল, জলকে বাষ্প ও বরফে পরিণত করিতেছেন। বিশ্বকর্ত্তা রাসায়নিকের কত বড় আকাশ কারখানা, নিমেষে নিমেষে কত কি কাণ্ড হইতেছে!

৬। সমুদ্র এত বৃহৎ হইলেও শুষ্ক হইয়া যাইত, অনবরত নদীর স্রোতের জলই তাহাকে রক্ষণ ও পোষণ করিতেছে।

৭। নদীর জন্মস্থান অজ্ঞাত নির্জ্জন দুর্গম স্থানে, কিন্তু ইহার কার্য্য কাহার অবিদিত? কার্য্যদ্বারাই লোকের গৌরব।

৮। নদী যে সমুদ্রের জলে উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কত পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল, মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া যায় এবং অবশেষে যখন তাহার সাক্ষাৎ পায়, তখন কত নৃত্য ও আনন্দ কোলাহল করিয়া তাহার সহিত মিশিয়া যায়; সমুদ্রও কেমন তরঙ্গ বাহু তুলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আপনার দেহের মধ্যে স্থান দেয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্মিলন এইরূপ।

৯। গ্রীষ্মে যে সকল নদী শুকাইয়া গিয়াছিল, তাহাদের খাদ সকল জলের অপেক্ষায় ছিল, তাই বর্ষাগমে আজি সেখানে বড় তুফান। প্রার্থনাশীল লোক কখনও নিরাশ হয় না।

১০। বাঁধের একস্থানে একটী ছিদ্র হইলে তদ্দ্বারা অনবরত জল নির্গত হইয়া তাহার আয়তন বৃদ্ধি করে এবং অবশেষে সমস্ত বাঁধকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। চরিত্রে একটী ক্ষুদ্র দোষ প্রবেশ করিলে সমুদায় চরিত্রকে নষ্ট করিয়া দেয়।

কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর! তোমার কৃপাতে শুষ্ক-ভূমি সরস এবং মরু প্রান্তর সমুদ্র হইয়া যায়। আমরা যেন কখনও তোমার কৃপাতে নিরাশ না হই। আমাদিগের জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে প্রাণ পণে চেষ্টা করিব এবং তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব। তোমার কৃপা পবন যখন বহিবে, তখন প্রতিকূল অবস্থা অনুকূল হইবে, তখন জীবনের ভার লঘু হইবে, এবং তখন সকল পরিশ্রমের শান্তি হইবে। তোমার কৃপা গ্রহণে আমরা সর্ব্বদা যেন প্রস্তুত হইয়া থাকি এবং হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া রাখি। বর্ষার ন্যায় তোমার প্রেম বন্যা আসিয়া আমাদিগের জীবনকে ভাসাইয়া দিবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বিজলী বা নারী ভাগ্য উপন্যাস—আরণ্য প্রসূন প্রভৃতির প্রণেতা শ্রীবামাচরণ বসু প্রণীত, মূল্য ১৷০ টাকা। ইহা সিপাহী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইহাতে অনেকগুলি অদ্ভুত ও মনোজ্ঞ দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে এবং নারীভাগ্যে কত দুর্ঘটনা ও ক্লেশ সম্ভব, তাহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে "সহিষ্ণুতাই সারধর্ম্ম" এই বাক্য স্বর্ণাক্ষরে খুদিয়া পুস্তকের উপসংহার করা হইয়াছে। পাঠিকাগণ এই পুস্তক পাঠে চিত্ত বিনোদন ও উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৮ই জুলাই আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মা ডাল সাহেব ৭০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ৩৫ বর্ষকাল ভারতবর্ষের হিতসাধনে সর্ব্বপ্রযত্নে নিযুক্ত ছিলেন, গরিব দুঃখী এবং স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি সাধনে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। ইহাঁর মৃত্যুতে ভারত একটী প্রকৃত বন্ধু হারাইলেন।

২। পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনে টোরীদল সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হইয়াছেন। গ্লাডষ্টোন পদত্যাগ করিয়াছেন। লর্ড সালিসবরী আবার প্রধান রাজমন্ত্রী হইবার সম্ভাবনা।

৩। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে গুজ-

রাটী ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। এই ভাষায় অনেক স্ত্রীকবি আছেন। পুরীবাই, গৌরীবাই, কৃষ্ণাবাই এই শ্রেণীর মধ্যে গণনীয়, কিন্তু মীরাবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৪। মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ রমণীগণ বেশ কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের একজন হাইদ্রাবাদে খুব পশার করিয়াছেন, একজন উদয়পুরের মহারাজার পরিবারের ডাক্তার, একজন লেডী ডফরিণ স্থাপিত-কলিকাতা ডিস্‌পেন্‌সারীর অধ্যক্ষ, এক জন আলওয়ারের স্ত্রী হাঁসপাতালের কর্ত্রী। সম্প্রতি এক যুবতী ভূপালের স্ত্রী হাঁসপাতালের কার্য্যভার লইয়া তথায় যাইতেছেন।

৫। যুবরাজ মাধো মহারাজ সিন্ধিয়া এবং শিবজী রাও হলকার গোয়ালিয়ার ও ইন্দোরের গদ্দিতে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

স্বপ্নে স্বর্গদর্শন।

(গত বারের পর)

কোথা যমপুরী প্রেতাত্মা-আশ্রয়
ঘোর বিভীষিকাময়,
কোন্ দেশে গেলে ধর্ম্ম অধর্ম্মের
যথার্থ বিচার হয়?
আছে কি ত্রিদিব, বৈজয়ন্ত ধাম
দেবদ্যুতি বিভাসিত?
আছে কি তথায়, পুণ্যাত্মা আত্মার
নিত্য সুখ বিরাজিত?
যার নাই মনে, পাপ-পুণ্যভয়
সে মরিলে কোথা যায়?
সরলতাময়, পবিত্র জীবন
কোথায় আশ্রয় পায়?
কে বলিবে কোথা! দূর ভবিষ্যতে
আছে রে বিলীন হয়ে,
ছায়া বাজীপ্রায়, জাগিছে হৃদয়ে
পোড়া স্মৃতি জ্বালাইয়ে।
এমনি কত কি, চিন্তার প্রবাহ
সাগর তরঙ্গ মত,
একটি বিলয়ে, একটি উঠিছে
লহরী তুলিছে কত!
নিস্তেজ হইল, চিন্তিত হৃদয়
অলসে অবশ প্রাণ,
এলাইয়ে প'ল, শিথিল ইন্দ্রিয়,
বিলীন হইল জ্ঞান।
বহিল মৃদুল নৈশ সমীরণ
অবগাহি শশি করে,
বিরামদায়িনী, সুষুপ্তি সুন্দরী
চেতনা লইল হরে।

নিদ্রার আবেশে দেখিনু স্বপন
মানসমোহন বেশে.
যেন এক ধনী নবীনা যুবতী
দাঁড়াল আমার পাশে।
মৃদু হাসি হাসি চাঁদ মুখ খানি
উষার নলিনীসম,
করে ঢল ঢল লাবণ্য বিমল
প্রভায় পলায় তমঃ।
প্রফুল্ল কমল, আয়ত লোচন,
মুকুতা-দশন-পাঁতি,
পড়েছে কুণ্ডল, নিতম্ব লুটায়ে
নবীন নীরদ-ভাতি।
সুনীল বসন, সোণার বরণ,
আবরি, জঘনে দোলে ;
দুকুল কাঁচলী, মুকুতা-খচিত
সুচারু হৃদয়-কোলে।
ললাটেতে আঁকা, চন্দনের রেখা,
কুসুমের হার গলে,
ইন্দুভাতি সম, সীমন্তে সিন্দুর
ঝক্ ঝক্ করি জ্বলে।
হয় বিকীরণ, স্বর্গীয় সৌরভ
লাবণ্যের সহ মিশি,
ছুটে অলিকুল, বিমল সৌরভে
আমোদিত হয় দিশি।
কোমলতা-মাখা, নবীন যৌবন
রূপের প্রতিমা খানি,
(যেন) গড়িয়াছে বিধি, বসি নিরজনে
জগৎ-সৌন্দর্য্য আনি।
আসি সুহাসিনী, মরালগমনে
দাঁড়াল মোহিনীসাজে,

যেন বিভাসিল, বিজলীর ছটা
সুনীল নীরদ-মাঝে।
চমকি উঠিনু, রূপের প্রভায়
শুধানু সপ্রেমে তারে,
"কে তুমি সজনী, ভুবনমোহিনী!
এসেছ দুখিনী তরে?"
হাসি রূপময়ী, কোকিল-ঝঙ্কারে
কহিল 'শুন লো, সই!
অমর-ললনা, সুরবিলাসিনী
ত্রিদিব-ভুবনে রৈ!
না জানি সজনী, হিংসা, দ্বেষ কভু
রোগ তাপ শোক জ্বালা,
মনের সুখেতে, থাকি ফুল বনে,
কেবল গাঁথি লো মালা;
সংসারের জ্বালা, পশে না অন্তরে
অনন্ত সুখের ধাম,'
ভ্রমি ত্রিভুবন, অলস ছাড়িয়ে
কল্পনা আমার নাম!
দেখি তোর দুখ, কাঁদে লো পরাণ,
তাই ত এসেছি হেথা,
(তোরে) নিরদয় বিধি, কোমল যৌবনে
দিয়েছে অনেক ব্যথা।
যে বঁধুর লাগি, কাঁদিস সজনী!
দেখিতে বাসনা তারে?
আয় অভাগিনী, সঙ্গিনী হইয়া
অনন্ত গগনোপরে!"
বলিয়া রঙ্গিণী মিশাইয়া গেল
আর না দেখিতে পাই,
আঁধার অম্বর, স্বরগের পথ,
কাহার সনেতে যাই? (ক্রমশঃ)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬০ সংখ্যা | ভাদ্র ১২৯৩—সেপ্টেম্বর ১৮৮৬। | ৩য় কল্প ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনীর ত্রয়োবিংশ জন্মোৎসব।

পুনঃ শুভদিন আজি হইল উদয়,
বল ভাই বোন সবে জগদীশ জয়।
সারমাত্র কৃপা তাঁর, সর্ব্ব সুখ মূলাধার,
জীবের জীবন বল সহায় সম্বল,
আজি সবে ঘরে ঘরে,বামাবোধিনীর তরে
যাচ সেই কৃপা, কর হর্ষ কোলাহল।

প্রতি গৃহ জ্ঞানালোকে হোক্ দীপ্যমান,
প্রতি গৃহ হোক্ পুণ্য আরামের স্থান,
গৃহে গৃহলক্ষ্মীগণ, প্রেম শান্তি বিতরণ,
করিয়া করুন্ ধরাতল স্বর্গধাম।
বামাবোধিনীর চিত, হয়ে হর্ষে পুলকিত,
সবার সুখেতে সুখী, হোক্ পূর্ণকাম।

১২৭০ সালের ভাদ্রে বামাবোধিনীর শুভ জন্ম হয়, সুতরাং এই ভাদ্রে ইনি ২৩ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ২৪ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। ইহাঁর এই আয়ুর্বৃদ্ধি উপলক্ষে সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের চরণে আমরা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণিপাত করি এবং ইহাঁর ভাবী কল্যাণোদ্দেশে তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে দুর্ভাগিনী বঙ্গবালাগণের মুখপাত্র এই পত্রিকাখানি

যে এতদিন জীবন ধারণ করিয়া আছেন, এ কেবল তাঁহারই করুণাতে। তাঁহার করুণাতে বর্ষের পর বর্ষে এ দেশের নারী-গণেরও উন্নতির পথ অধিকতর প্রসারিত হইতেছে। বামাবোধিনী যেন এই উন্নতির সহকারিণী হইয়া আপনার ক্ষুদ্র জীবনকে সার্থক করিতে পারেন, সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদিগের এইমাত্র প্রার্থনা।

যে সকল ভাই ভগিনী বামাবোধিনীকে ভালবাসার চক্ষে দর্শন করেন এবং ইহার কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন, আজি বামাবোধিনী নতমস্তকে তাঁহাদিগকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিতেছেন। অনুকম্পাশীল গ্রাহক সাধারণকেও সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক অনুরোধ করিতেছেন, আজি তাঁহারা ইহাঁর সমুদায় দোষ ও ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া ইহাঁর প্রতি স্নেহ দৃষ্টিপাত করুন, তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ ও সহায়তা লাভ করিলে ইনি আপনার অবলম্বিত ব্রত পালন করিয়া সম্যক্‌রূপে তাঁহাদিগের সন্তোষ বিধানে সমর্থ হইবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন মন্ত্রিসভা ও আয়র্লণ্ড—সালিসবরী প্রধানমন্ত্রী হইয়া নূতন মন্ত্রি-সভা সংগঠন করিয়াছেন। উদারনৈতিক দলের ন্যায় সদ্ভাব ও কৌশলে রাজ্য শাসন করিতে ইহাঁরা প্রস্তুত নহেন, বল দ্বারা সাম্রাজ্যের শান্তি স্থাপন করিবেন। আয়র্লণ্ডবাসীদিগের উপর প্রথম বল পরীক্ষা হইবে। আইরিসগণ ইতিমধ্যে বেলফাষ্ট নগরে একটী ছোট খাট যুদ্ধ অভিনয় করিয়াছে। আমেরিকার অনেক লোক তাহাদের পক্ষে। আয়র্লণ্ড লইয়া একটা ঘোর বিভ্রাট ঘটনার সম্ভাবনা।

রচনা পুরস্কার—শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন :—

"এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত" এই বিষয়ে রচনা যে কোন বঙ্গমহিলা ইচ্ছা করেন, সংস্কৃত বা বাঙ্গালাতে লিখিয়া আগামী ২৮এ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রেসিডেন্সী বিভাগের ইনস্পেক্টর আফিসে পাঠাইবেন।

SUPPLEMENT TO THE BAMABODHINI PATRIKA.

বামাবোধিনীর উপহার।

মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত।

জাত—১লা শ্রাবণ ১২২৭ সাল। মৃত—১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ সাল।

রুগ্ন—১২৬২ হইতে ১২৯৩ পর্য্যন্ত।

তাহার সঙ্গে লেখিকার পিতা, স্বামী, বা অপর কোন অভিভাবককে লিখিয়া দিতে হইবে যে লেখিকা অপর কাহারও সাহায্য লন নাই। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তিনি বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত ৪০ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

ব্যবসায়ী।—কৃষিবিদ্যায় সুপণ্ডিত বিলাত প্রত্যাগত বাবু শ্রীনাথ দত্তের 'ব্যবসায়ী' পত্রের পুনঃ প্রচার দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। পত্রখানি এবার বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইতেছে, প্রবন্ধ সকলও বিচিত্র ও উপাদেয়। ইহা হইতে দুই একটী প্রয়োজনীয় বিষয় উদ্ধৃত হইল :—

(১) কাচ যুড়িবার পুটিন—ইহাদ্বারা সকল প্রকার কাচের বাসন যোড়া যায়। ৪ ঔন্স (২ ছটাক) তিসির তৈলে আন্দাজ এক মুঠা গুঁড়া চুণ দিয়া পাত্রে করিয়া জ্বালে চড়াইতে হয়। জ্বালে চড়াইবার সময় কিছু পাতলা থাকে, পরে জ্বাল দিতে দিতে আটা আটা হইলে ইহা নামাইতে হয়। জুড়াইয়া গেলে অতিশয় শক্ত হয়। ব্যবহার কালে পুনরায় গরম করিয়া লইলে আবার তরল হইয়া যায়। এই উপকরণে যোড়া হইলে পরে আর উত্তাপ লাগিলেও সহজে গলিয়া যায় না।

(২) জুতা ক্রসের কালী—স্পিরিটে গালা গলাইয়া বার্ণিস প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে তাহাতে আন্দাজ মত ভুষা কালী দিয়া নাড়িয়া লইতে হইবে। ইহা জুতায় মাখাইয়া দিলেই হইল, আর ক্রস করিতে হইবে না।

ঘৃতে চর্ব্বি—স্বাস্থ্যরক্ষকের পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে, কলিকাতায় যে ঘৃত বিক্রীত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ চর্ব্বি মিশ্রিত। এই চর্ব্বি না কি গো শূকর বিড়াল প্রভৃতি জন্তুর দেহ হইতে গৃহীত। ব্যবসায়ীরা এইরূপ ঘৃত বিক্রয় দ্বারা বিশেষ লাভবান হইয়াছে এবং ক্রমশঃ ভাঁজাল বৃদ্ধি করিতেছে। এদিকে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই জাতি নাশ ও ধর্ম্ম নাশ হইতেছে! ইহাদ্বারা স্বাস্থ্যেরও যে হানি হইতেছে না, নিঃসংশয়ে বলা যায় না। ঘৃত ভক্ষণে বিশেষতঃ দোকানের মিঠাই ভক্ষণে সকলের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

বঙ্গমহিলা সমাজ—গত ২রা আগষ্ট সিটী কলেজ গৃহে বঙ্গমহিলা সমাজের সপ্তম সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সায়ংসমিতি হয়। তথায় সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ ফাদার ল্যাফোঁ মাজিক লণ্ঠন যোগে লণ্ডন ও উইণ্ডসর নগরের প্রসিদ্ধ অট্টালিকা প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করেন এবং অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু বৈদ্যুতিক আলোক দেখান। সমিতিতে বহুসংখ্যক মহিলার সমাগম হইয়াছিল। কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত শ্রবণে এবং ছায়াবাজী ও আলোক দর্শনে সকলে পুলকিত হইয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্ম-বিপ্লব—আজিও ইহার শান্তি না হইয়া ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে। হংমাত নামে থিবর এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ডাকাইতদলের সাহায্য পাইয়া স্বুইবো নগর আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন, ইহাদের সঙ্গে প্রায় ১১০০ লোক।

ইতিপূর্ব্বে ইহাদের সহিত ইংরাজ সেনাদিগের কয়েকটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল। ব্রহ্মযুদ্ধে যত ইংরেজ সেনাধ্যক্ষের পতন হইয়াছে, আসিয়ায় আর কোন যুদ্ধে নাকি তত হয় নাই ! !

তিব্বতযাত্রা—ইংরাজ দূতের তিব্বতযাত্রা রহিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সিকিমের রাজার সহিত যোগ করিয়া তিব্বতের অবস্থা গোপনে অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ; কিন্তু তিব্বতেরা পূর্ব্বে সাবধান হইয়া তাহাদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়াছে। তিব্বতেরা রণসজ্জা করিয়া এক্ষণে ভারত আক্রমণে অগ্রসর।

বিরাট আসিয়াটিক প্রদর্শন।—জাপানের টোকেও নগরে ১৮৯০ সালে এক মহা মেলা হইবে, এখন হইতে তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে।

সুগুণবোধিনী—ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বামাবোধিনীর আদর্শে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতিসাধনার্থ পত্রিকা সকল প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি। বোম্বাই প্রদেশে 'স্ত্রীবোধ' এক বৎসর কাল চলিতেছে। মান্দ্রাজে তামিলভাষায় 'সুগুণবোধিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত।

বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় লেখক মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কত প্রাণগত যত্ন ও আগ্রহ ছিল, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি, ভবিষ্যতেও কিছু কিছু করিব। বামাবোধিনীর জন্ম মাসের এই পত্রিকায় তাঁহার স্মরণার্থ আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিলাম এবং পাঠিকাগণের ব্যবহারার্থ তাঁহার এক একখানি ছবি উপহার প্রদান করিলাম।

১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণে চুপী নামক গ্রামে অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষে তাঁহার হাতে খড়ি হয় ; গুরু মহাশয়ের অভাবে প্রায় দুই বৎসর বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ থাকে। ৭।৮ বৎসর বয়সে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লিখিতে যান। পাঠশালায় কাঠাকালী বিঘাকালী লিখিবার সময়ে তাঁহার মনে হইয়াছিল, "পৃথিবী কত বিঘাই হইবে ? পৃথিবীর সীমাইবা কোথায় ? তাহার পরেই বা কি ? যদি তাহার পরে আকাশ হয়, আকাশই বা কত দূর ?" পাঠশালায় কিছু কাল শিক্ষার পর তাঁহাকে পারসী পড়িতে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পারসী পড়া অধিক দিন চলে নাই। দৈবযোগে পিয়ার্সন্ সাহেবের প্রণীত ইংরাজী ও

বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত একখানি ভূগোলের বাঙ্গালা অংশে মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত প্রভৃতি বিষয় পাঠ করিয়া, অনেক নূতন অথচ প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিলেন বলিয়া, ইংরেজী অধ্যয়নে তাঁহার আগ্রহ জন্মিল। কিছু দিন বাটীতে ইংরেজী পড়িতে থাকেন। তাহাতে বিশেষ সুযোগ না হওয়ায়, অনেক কষ্টের পর "ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারীতে" প্রবিষ্ট হন। এখানে ২॥০ আড়াই বৎসর কাল মাত্র পড়া চলে। পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া, ন্যূনাধিক ৬ ছয় মাস পাঠের পর তৃতীয় শ্রেণীতে উঠেন। এই শ্রেণীতে ১ এক বৎসর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে আর এক বৎসর পড়েন। মোটে এই ২॥০ বৎসর বিদ্যালয়ে শিক্ষা। বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ে পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে স্কুলের পড়া শেষ হইল বটে, কিন্তু তিনি বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। বাটীতে থাকিয়া গণিত-বিদ্যার উচ্চ অঙ্গ সকল ও বিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সংবাদ-প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ঘটে। এই সময়ে ও ইতিপূর্ব্বে তিনি কেবল পদ্য লিখিতেন। হঠাৎ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধে তাঁহাকে গদ্য লিখিতে হয়। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলে, বাঙ্গালা লিখিবার উত্তম ক্ষমতা জন্মিবে বলিয়া, ১৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দত্তজ মহাশয় সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ তদ্বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ সংস্কার জন্মে। অধিক কি, তিনি সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করিতেন। তাঁহার মাতৃভক্তি কিরূপ প্রবল ছিল, তাঁহার রচিত একটী শ্লোকেই তাহা প্রমাণিত হইবে, এই নিমিত্ত সেই শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম,—

"প্রত্যক্ষ-দেবতা-মাতুশ্চরণং কমলায়তে।
অঙ্গুল্যশ্চ দলায়ন্তে, মনো মে ভ্রমরায়তে॥"

ইহার ভাবার্থ এই —মাতা প্রত্যক্ষ দেবতা। তাঁহার চরণ পদ্ম-স্বরূপ। পদ্মের দল অর্থাৎ পাপ্ড়ি থাকে, জননীর পাদ-পদ্মের অঙ্গুলিগুলি পাপড়ি-তুল্য। পদ্মে ভ্রমর থাকে, মাতার চরণ-পদ্মেও ভ্রমর থাকা চাই, অতএব আমার মন তাহাতে মধুকর হইয়াছে।

কেমন ভাবশুদ্ধ, মধুর কবিতা! কেমন মাতৃভক্তি! স্ত্রীজাতির প্রতি দত্ত মহাশয়ের শ্রদ্ধার সূত্রপাত এইখান হইতে হইয়াছে। ইহারই পরে একদিন ঈশ্বর বাবুর সঙ্গে অক্ষয় বাবু কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে গমন করেন; তথায় মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়েই দেবেন্দ্র বাবুর সহিত অক্ষয় বাবুর আলাপ হইল। এই আলাপ উত্তরোত্তর বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং তিনি দেবেন্দ্র বাবুর অভিমতানুসারে "তত্ত্ববোধিনী সভার" সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। অতঃপর তাঁহাকে "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" নামক বিদ্যালয়ের ভূগোল শাস্ত্র ও পদার্থ

বিদ্যার শিক্ষকের পদে নিয়োজিত করা হয়। ইহারই পরে ১২৪৯ সালে "বিদ্যাদর্শন" নামক মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। ৬ মাস ঐ পত্রিকা স্থায়ী হয়। তৎপরে ১২৫০ সালে সুবিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সৃষ্টি হয়। অক্ষয় বাবু প্রথমাবধি ১২ দ্বাদশ বৎসর কাল উহার সম্পাদক ছিলেন। এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া তাঁহাকে এত দূর পরিশ্রম করিতে হইত যে, যথাসময়ে আহারাদি চলিত না। ক্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল। নিদারুণ মস্তিষ্ক পীড়া তাঁহাকে জন্মের মত নিস্তেজ করিয়া ফেলিল। ১২৬২ সালে এই রোগের উৎপত্তি হয়। তদবধি ১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ঐ রোগ ভোগ করিয়াছিলেন। এই রোগের অবস্থায় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালী গ্রামে স্ব-প্রতিষ্ঠিত একটী সুন্দর উদ্যানে বাস করিতেন। সেইখানেই ১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৩টা ১৫ মিনিটের পর তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হয়।

অক্ষয় বাবুর প্রণীত গ্রন্থ সকল:— চারুপাঠ ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ১ম ও ২য় ভাগ, ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ১ম ও ২য় ভাগ।

অক্ষয় বাবু কেবল বঙ্গ সাহিত্যের এক জন জন্মদাতা ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার মানসিক শক্তি ও চরিত্রের বল বঙ্গীয় সমাজের আদর্শ। এক দিকে তাঁহার শাস্ত্রানুশীলনে অক্লান্ত অধ্যবসায়, গভীর তত্ত্বানুসন্ধানেচ্ছা ও অতি সূক্ষ্ম ও পরিস্কৃত বিচার শক্তি দেখা যায়। অন্য দিকে তাঁহার নম্রতা, সরলতা, দেশহিতৈষণা, স্বজাতিপ্রেম, মাতৃভক্তি, দয়া, ক্ষমা, বাক্য-নিষ্ঠা, কার্য্য-নিষ্ঠা প্রভৃতি অসাধারণ গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে পুস্তকের আয়ে ৩৬ হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং এই টাকার অধিকাংশ স্বদেশের হিতার্থ ব্যয়ের জন্য উইল করিয়া গিয়াছেন।

এস্থলে অক্ষয়কুমার বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত মাত্র প্রকাশিত হইল। যাঁহারা তাঁহার চরিত্র-বিষয়ে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় বিরচিত অক্ষয় বাবুর জীবনী পাঠ করিবেন।

ছায়া।

(বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।)

(১)

কি বলিয়ে দিবে ছায়া আত্ম-পরিচয়?
এ বিশ্ব-জগত-মাঝে
সদাই মলিন সাজে,
জীর্ণ, শীর্ণ কলেবর, শঙ্কিত-হৃদয়;—
কি বলিয়ে দিবে ছায়া আত্ম-পরিচয়?

(২)

আঁখিটি তুলিয়ে কথা কহিতে না পারি!
এক ধারে পড়ে থাকি,
নিজ মান নিজে রাখি,
নিজ দুঃখ ভাবি করি নিজেই রোদন,
নিজের বিলাপ-গীতি, নিজেই শ্রবণ!

(৩)

সুদূর-জগত-বাসী চিনিবে কেমনে?
আপন সন্তান হায়!
চিনে না আপন মায়;
কোলেতে তুলিতে গেলে প্রাণে লাগে ভয়—
অত্যাচার অসত্যের করে অভিনয়!

(৪)

আজিরে নূতন ব্যথা বেজেছে মরমে!
জননীর যাতনায়
কে তোরা কাঁদিবি আয়—
কে শুনিবি এ প্রাণের যন্ত্রণা-কাহিনী?
আমি ছায়া—বঙ্গভাষা—আমি অভাগিনী!

(৫)

অক্ষয় অক্ষয়-ছেলে কই রে আমার?
বিদারি মানস-খনি
দীপ্ত কোহিনুর মণি
কে লয়ে ডুবাল আজি সাগর-মাঝার?—
আলোকের-গৃহ মোর কেন অন্ধকার।

(৬)

দুখিনীর ছোট খাটো পুত্র-কন্যাগণ,
ছোট সুখ-দুঃখ ল'য়ে,
ক্ষুদ্র আশা ব'য়ে ব'য়ে,
কাটাইত ছোট খাটো জীবনের কাল,—
ক্ষুদ্র-গৃহ করিত না চোখের আড়াল!

(৭)

কে আর সে ক্ষুদ্র-চক্ষু করি প্রসারিত,
বঙ্গের সন্তান-গণে
অনন্তে টানিয়ে এনে,
দেখাইবে অসীমের মূরতি ভয়াল,
ব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড কত—কতই বিশাল?

(৮)

মানব-প্রকৃতি-রীতি করিয়ে বিচার,
কেবা আর যথাযথ
শিখাবে স্বাস্থ্যের পথ?
শিখাইবে তন্ন তন্ন শাস্ত্র দরশন—
চেতনেতে অচেতন সংযোগ কেমন?

(৯)

বসাইয়ে নারী-নরে একই আসনে,
কে শিখাবে ধর্ম্মনীতি—
দাম্পত্য-প্রণয়-রীতি?
অত্যাচার কদাচার করি অবসান,
কে শিখাবে পুণ্যপথ—স্বর্গের সোপান?

(১০)

হায় হায়! যেতে যেতে মরণের পথে,
কভু দুই চারি ছত্র,
কভু দুটি কথা মাত্র,

উপাসক-সম্প্রদায় কে রচিবে আর,
উজলিতে ভারতের সাহিত্য-ভাণ্ডার ?

(১১)

হা হা বাছা ! বলিতে যে বিদরে হৃদয় ;—
মুমূর্ষু-শয্যায় শুয়ে,
নিরাশা-সন্তপ্ত-হিয়ে,
আক্ষেপে কে করে অশ্রু করি বরিষণ—
'কত মনে ছিল সাধ—হ'ল না পূরণ' ?

(১২)

কেবা আর সেবিবারে মায়ের চরণ,
কল্পনা-উৎসবে মাতি
জেগে রবে সারা-রাতি ?
কহিবে বিনম্র-কণ্ঠে বিস্মিত-লোচনে—
'এত শীঘ্র দীর্ঘ-নিশা পোহায় কেমনে' ?

(১৩)

এ গগনে কেন আর জাগিস্ তারকা ?
কে আর বিহ্বল-প্রাণে
চাহিয়ে তোদের পানে,
সস্নেহ ঔদাস্য-ময় বিরক্তির ভাব
কুপিতা পত্নীর প্রতি করিবে প্রকাশ ?

(১৪)

এ কাননে কেন আর তরুলতাচয় ?
কে আর কবির মত
মুগ্ধ ভালবাসা যত
তোদের প্রাণের পরে করি বিকিরণ,
চেয়ে চেয়ে বিস্মৃতির হেরিবে স্বপন ?

(১৫)

কাঁদিছে জননী—বাছা ! আয় ফিরে আয় ;—
কুতার্কিক সন্তানেরা,
পথ ভুলে হ'ল সারা ;
আজিও অসত্যে দিয়ে সত্যের আকার,
পূজিতেছে ঘৃণীয় কত দেশাচার !

(১৬)

আয় বৎস ! ধর্ম্মনীতি শিখারে আবার ;
ভারত-বাসীর চিত,
পুন করি সঞ্জীবিত,
শিখায়ে কর্ত্তব্য-পথে সাধনা কঠোর ;
মুছায়ে মলিন-চক্ষে অবিদ্যার ঘোর।

(১৭)

হায় ! সে যে বৃথা আশা মিটিবে না আর
যাও বৎস ! বসো তবে,
যথায় সানন্দ-রবে
বিবুধ-মণ্ডলী করি হস্ত সঞ্চালন,
দেখায়ে দিতেছে দিব্য স্বর্ণ-সিংহাসন।

(১৮)

চির-অকৃতজ্ঞ অন্ধ বঙ্গের সন্তান ;
তারাও উৎসুক-মন,
যত্নে করি আহরণ
গাঁথিয়ে চরিত-মালা পরেছে গলায় ;
আবার স্মৃতির স্তম্ভ তুলিবারে চায়।

(১৯)

যত দিন রবি শশী শোভিবে গগনে,
যত দিন বঙ্গভাষা,
বাঙ্গালীর উচ্চ-আশা,
তত দিন খুলি সবে হৃদয়-দুয়ার,
অক্ষয় ! অক্ষয়-কীর্ত্তি ঘোষিবে তোমার।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

পুরাণের (পদ্ম) কাল।

এইবারে আমরা দুইটী ধর্ম্মিষ্ঠা নারীর প্রসঙ্গ করিতেছি। একের নাম চন্দ্রকলা, অপরের নাম সুলোচনা। সুলোচনা রাজকুমারী,রাজমহিষী ; চন্দ্রকলা তাঁহারই দাসী। দাসী হইয়াও, তিনি স্বীয় কর্ত্রীর উপর স্থান পাইয়াছেন। ধর্ম্মজ্ঞানে তিনি সুলোচনাপেক্ষা গরিষ্ঠ ছিলেন, এই তাঁহার মহত্ত্বের কারণ। প্রভুর অগ্রে ভৃত্যের সম্মাননার হেতু পাঠিকারা নিজে নিজেই বুঝিতে পারিবেন, বলিয়া মূল বিষয়ে প্রবিষ্ট হইলাম।

৪১—চন্দ্রকলা।

তালধ্বজ নামক প্রদেশে বিক্রম রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মাধব নামে এক সন্তান ছিল। মাধব ভূপতি একদিন স্বীয় দল-বল-সহকারে শিকারে নিষ্ক্রান্ত হন। সৈন্য সামন্তকে পশ্চাতে ফেলিয়া অতি প্রচণ্ড বেগে তিনি এক লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। ক্রমে নিবিড় বিপিনের অভ্যন্তরে গিয়া সমুপস্থিত হইলেন। সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ বন-খণ্ডে একটী মাত্রও অনুচর বা সহচর তাঁহার সঙ্গে নাই। এই সময়ে তিনি সম্মুখ ভাগে এক লাবণ্যময়ী রমণী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সেই নারীর নাম চন্দ্রকলা। চন্দ্রকলা সেই বনাভ্যন্তরস্থ জলাশয় হইতে জল আনয়নের কারণ আসিতেছিলেন। তিনি বীরবাহু নামক এক ক্ষত্রিয়ের প্রিয়তমা। তালধ্বজ পুরীই তাঁহার বসতিস্থান ছিল। তিনি প্লক্ষ দ্বীপের অন্তর্গত দীব্যন্তী নগরীর অধিরাজ গুণাকরের সুলোচনা নাম্নী কন্যার সখীর কার্য্য করিতেন, এক্ষণে সহচরীর কার্য্য ত্যাগ করিয়া তালধ্বজ পুরীতে অবস্থিতি করেন। মাধব নৃপতি প্রথমতঃ নিঃসহায় অবস্থায় তাঁহার সন্দর্শন লাভে ভীতিমুক্ত হইয়া আশ্বস্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার অন্তঃকরণে কলুষময় ভাবের আবির্ভাব হইল।

রাজতনয় গান্ধর্ব্ব বিধানে কন্যার পাণি-গ্রহণাভিলাষী হইয়া, তাঁহার নিকট স্বাভিলাষ ব্যক্ত করিলে, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, পণ্ডিতেরা যে বলিয়া থাকেন, 'ধর্ম্ম স্বয়ং ধার্ম্মিককে বিপদ হইতে রক্ষা করেন'*—এই মহাবাক্য অদ্য এই দণ্ডেই পরীক্ষিত হইবে। তৎপরে তেজস্বিনী ধর্ম্মশীলা চন্দ্রকলা কি কি যুক্তিগর্ভ বচন প্রয়োগ করিয়া রাজকুমারকে শাসিত ও পাপচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, পাঠিকারা শ্রবণ করুন।

* জল্পন্তি সুরয়ঃ সর্ব্বে 'ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং'।

চন্দ্রকলা।—হে নৃপবর! রাজার সুশাসনে রাজ্যের তাবৎ লোক দুষ্ক্রিয়া ও কলুষাদি হইতে বিমুক্ত হয়, ইহা অপেক্ষা রাজার শ্লাঘ্য আর কি আছে? সৎস্বভাব ভূপালগণের রাজত্ব মধ্যে ঐরূপই ঘটিয়া থাকে। সমস্ত শাসকই যদি আপনার মত দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে থাকেন, তবে আর কে তাহাদিগকে চালিত করিবে? বিরল স্থল পাইয়াছেন বলিয়াও, ওরূপ প্রস্তাব করা আপনার সদৃশ ব্যক্তির উচিত হয় নাই। পরাৎপর ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান, ইহা আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন। মহাভাগ! আমাকে অনূঢ়া ভাবিবেন না। আমি বীরবাহু ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যা, সলিল আনয়ার্থে এখানে আগমন করিয়াছি, এই বিভীষিকা-সঙ্কুল স্থলে অন্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধির কারণ আসি নাই। আপনি স্ববংশানুরূপ ও রাজোচিত বাক্য না বলিয়া, তদ্বিপরীত কেন কহিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না। ভবদ্বংশীয়গণ পরস্ত্রী-বিষয়ে ক্লীববৎ আচরণ করিতেন। আমি একাকিনী, অসহায়া ও অবলা। আপনি একাকী হইলেও ভীম পরাক্রমশালী, পরম বীর, পুরুষপ্রবর। আমার পাতিব্রত্য নষ্ট করিলে, আপনার অযশ বৈ সুযশ হইবে না। মানব-জন্ম অতি দুর্ল্লভ। সেই দুষ্প্রাপ্য জন্ম লাভ করিয়া অকীর্ত্তিকর ক্রিয়া কলাপে মুগ্ধ থাকা বিজ্ঞজনোচিত কার্য্য নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারিবেন,—লোভ হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে পাপ, পাপ হইতে মরণ, মরণ হইতে নরক হয়। অতএব মনে মনে লোভের প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মৎস্য যেমন অজ্ঞতা দোষে মাংসাচ্ছন্ন বড়িশ গ্রাসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, আপনি সেইরূপ লোভাধীন হইয়া, মোহান্ধতা বশতঃ পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইবেন না। বিবেকই সম্পদের মূল এবং তদ্বিপর্য্যয় অর্থাৎ অবিবেক আপদ আনয়ন করে।

হে ক্ষিতীশ! প্লক্ষ দ্বীপান্তর্ব্বর্ত্তী দীব্যন্তী নগরে অশেষ গুণবান্ গুণাকর নরপালের সুলোচনা নাম্নী কন্যার আমি দাসী ছিলাম। যদি অভিরুচি হয়, তবে আপনি তাঁহার পাণি গ্রহণ করিতে পারেন। অদ্যাবধি তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। তাঁহার তুল্য রূপ-গুণবতী, সতী কন্যা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারিলে, আপনার মনোরথ সর্ব্বাংশে ফলপ্রসূ হইবে।

১৫—সুলোচনা।

চন্দ্রকলার বৃত্তান্ত সমাপন করিয়া সম্প্রতি সুলোচনার বিবরণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্লক্ষদ্বীপে দীব্যন্তী পুরীতে ইনি

জন্ম পরিগ্রহ করেন। ঐ নগরের অধিপতি গুণাকরের ঔরসে ও তৎপত্নী সুশীলার গর্ভে উহার উদ্ভব হয়। তদীয় রূপ, গুণ, স্বভাব, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বিষয় কিরূপ ছিল, বর্ণনা করা এক প্রকার দুর্ঘট। পূর্ব্বে আমরা যে চন্দ্রকলার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছি, সেই কন্যা তাঁহার পরিচারিকা ছিলেন। তালধ্বজ নগরস্থিত বীরবাহু নামক ক্ষত্রিয়ের প্রণয়িনী হইবার পর তিনি দীব্যন্তী হইতে নিজ স্বামীর নিকেতন তালধ্বজ প্রদেশে আগমন করেন। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যত দিন চন্দ্রকলা সুলোচনার প্রিয়তমা সহচরী ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের কি সুখেই দিন যাপন হইত। উভয়ের ধর্ম্ম-মত কত যে বিশুদ্ধ ছিল, এই আখ্যায়িকা আদ্যন্ত সমালোচন করিলে, তাহা হৃদ্গত হইতে থাকিবে।

চন্দ্রকলার বর্ণিত পূর্ব্বোল্লিখিত কথানুসারে মাধব রাজা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া দীব্যন্তী নগরে উপস্থিত হইলেন। সুগন্ধা নামক এক মালাকার বনিতার হস্তে এক স্বর্ণাঙ্গুরীয় ও তৎসহিত লিপি প্রেরণানন্তর স্বীয় মনোরথ বিজ্ঞাপন করিলেন। লিপির মর্ম্ম এই প্রকার ছিল,—'সুন্দরী! তোমার দাসীর মুখে তোমার রূপ, গুণ, বিদ্যা, চরিত্রাদির মহত্ত্ব অবগত হইয়া, সাগরপারে তোমার সন্ধানে এ নগরীতে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমার ইচ্ছা,—তোমার সহিত আমার পরিণয় বন্ধন স্থাপন হয়।'

মালাকার কামিনীর কর-বাহিত পত্রার্থ অবগত হইয়া সুলোচনা তাহার নিম্নলিখিত প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

সুলোচনা।—হে ভূপ! আপনার পত্রের তাৎপর্য্যার্থ পরিজ্ঞাত হইয়াছি। এখন তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই,—আপনি অবধারিত জানিবেন, অদ্য আমার অধিবাস দিবস (অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্ব দিন), আগামী কল্য বিবাহ হইবে। আমার পিতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করা কর্ত্তব্য নয়, আপনাকে কোন দুঃসাধ্য কার্য্যে লিপ্ত হইবার পরামর্শ দিতে আমার অভিলাষ হয় না। ক্রিয়া সফল না হইলে, পণ্ডশ্রম মাত্র হয় এবং তদর্থ মনুষ্যের অনর্থক উদ্যম-ভঙ্গ ঘটে। আপনি কেবল আমারই প্রাপ্তি নিমিত্ত সাগর উত্তরণ পূর্ব্বক বহ্বায়াস স্বীকার করিয়াছেন। কি উপায়ে আমার সঙ্গে আপনার বিবাহ সংঘটন হইবার সম্ভাবনা, তাহা আপনাকে এখন হইতে জানাইয়া রাখি। আমি বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া, মনোনীত বর স্থির করিবার জন্য যখন প্রদক্ষিণ করিব, তৎকালে আমার বাম হস্ত ঊর্দ্ধে রক্ষা করিব। যিনি আমার ঐ হস্ত ধরিয়া আমাকে লইতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকেই আমি পতিত্বে বরণ ও গ্রহণ করিব, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

এই লিপি খানি সুলোচনা মালাকার বনিতার হস্তে অর্পণ করিলেন। ওদিকে মালাকার-ভার্য্যার নিকট পত্রার্থ অবগত হইয়া মাধব ভূপ তদনুরূপ কার্য্যের উদ্যোগ করিলেন। বলা বাহুল্য, তদুপলক্ষে তাঁহাদের শুভ পরিণয়-ব্যাপার বিনা বাধায় সম্পন্ন হইয়া গেল।

এই খানেই প্রস্তাবের উপসংহার ভাগে আমরা উপনীত হইলাম। এই সন্দর্ভের বর্ণিত দীবান্তী ও তালধ্বজ প্রদেশ কোথায়, আমরা স্থির করিতে পারি না। উহাদের বর্ত্তমান নাম না পাইয়া অনেকে হয়তো উহা কাল্পনিক আখ্যা ভাবিতে পারেন। ফল কথা, মাধব, সুলোচনা, ও চন্দ্রকলার নাম হিন্দু শাস্ত্রানুশীলনকারীদের মধ্যে এত পরিচিত ও বিখ্যাত সংজ্ঞা যে, এক্ষণে উহাকে অবাস্তবিক ঘটনা বলিয়া অস্বীকার করা একপ্রকার হঠকারিতা বলিয়া বিবেচিত হয়। দীবান্তী বা তালধ্বজ অবাস্তবিক আখ্যা, তর্কের অনুরোধেই যদি স্বীকার করা যায়, তথাপি মূল উপাখ্যানটী অলীক বলা যায় না। সে যাহা হউক, চন্দ্রকলার ভর্ত্তা 'বীরবাহু' প্রকৃতই বীরবাহু অর্থাৎ মহাবল পরাক্রান্ত। এখানে শারীরিক তেজের প্রশংসা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আর চন্দ্রকলাও ঐ বীরবাহু "বীরবাহুরই" সার্থক প্রিয়তমা। তিনি স্বীয় কায়িক বলে এ প্রতিপত্তি লাভ করেন নাই, কিন্তু অতুল মনস্তেজে—সাধু চরিত্র প্রভাবে-আপামর-সাধারণের নয়ন যুগল বিস্ময়-রসে বিস্ফারিত করিয়া দিয়াছেন। এদিকে দেখ, সুলোচনা, নামেও যেমন সুনয়না, কার্য্যেও তেমন সৌভাগ্যবতী। অন্যথা তিনি চন্দ্রকলার মত কামিনীকে কি সখীর কার্য্যে পাইতেন? আর, তিনি যে বাল্যকালের সুমন্ত্রণাদায়িনী চন্দ্রকলার নির্ব্বাচিত সুপুরুষকে প্রাণ সমর্পণের যোগ্যপাত্র স্থির করেন, ইহাও তাঁহার ভবিষ্যৎ সুখের নিদান হইয়াছিল। মাধব ভূপবরকে আমরা 'সুপুরুষ' বলায় কেহ কেহ ভাবিবেন, ধর্ম্মনাশক রাজা যদি 'সু' হন, তবে 'কু' কে? বস্তুতঃ মাধব রাজা এক জন পাষণ্ড নহেন। চন্দ্রকলাকে অপরিণীতা ভাবিয়া ঐরূপ প্রস্তাব করেন। আর সে প্রস্তাবও নিন্দনীয় প্রস্তাব নয়। গন্ধর্ব্ব-বিবাহ-বিধি তৎকালে প্রচলিত ছিল। যদি তিনি সতীত্বধ্বংসকারী হইতেন, তবে তিনি চন্দ্রকলার বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়াও, বধিরবৎ আচরণ করিতেন। তাঁহার চরিত্রের স্বপক্ষে শেষ বক্তব্য যে, তিনি অসৎ হইলে, কখনই চন্দ্রকলা কর্ত্তৃক সুলোচনার নিকট প্রেরিত হইতেন না। অতএব সুলোচনা সুযোগ্য ভর্ত্তা লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি গুণাকর পিতার গুণবতী কন্যা এবং

সুশীলা মাতার সুশীলা দুহিতা। পিতা, মাতা, ভর্ত্তা, দাসী প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার শুভাদৃষ্টের প্রবল সহায়। চন্দ্রকলা ও সুলোচনা শব্দ দুটী যেমন শ্রুতিমধুর, তেমনই সম্বোদ্দীপক।

সিপাহি যুদ্ধের সময়ে ভারত মহিলার দয়া।

সিপাহি যুদ্ধের সময়ে আর একটি দরিদ্রা মহিলা আপনার অসাধারণ প্রভুভক্তির পরিচয় দেয়। এই মহিলার নাম বাম্‌নি। যখন সেই দুঃসময়ে সকলেই আপনার আপনার বিষয় লইয়া ব্যস্ত তখন দরিদ্রা বাম্‌নি পরের বিষয় রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছিল।

বাম্‌নি একজন ইঙ্গরেজ ডাক্তারের পরিচারিকা; সিপাহি যুদ্ধের সময় ডাক্তর অযোধ্যার সৈনিকনিবাসে চিকিৎসা কার্য্য করিতেন। একদা গভীর রাত্রিতে সংবাদ আসিল যে, অযোধ্যার সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তর আপনার কার্য্যানুরোধে স্বয়ং পলাইতে পারিলেন না; কেবল তাঁহার স্ত্রীকে তিনটি শিশু সন্তানকে লইয়া লক্ষ্ণৌ যাইতে পরামর্শ দিলেন। চিকিৎসক পত্নী সম্মুখে যাহা পাইলেন, তৎসমুদায় তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠাইয়া তিনটি শিশু সন্তানসহ লক্ষ্ণৌ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ডাক্তার অন্যান্য ইংরেজেরা যেখানে ছিলেন, সেই খানে গেলেন। দেখিতে দেখিতে চারি দিকে সিপাহিদিগের গৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল। চিকিৎসকর-মণী তিনটি সন্তান ও দুইটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত সেই ভয়ঙ্কর সময়ে ভীত চিত্তে লক্ষ্ণৌ নগরে যাইতে লাগিলেন। চিকিৎসক দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু আর গৃহে ফিরিলেন না। অন্যান্য ইংরেজদিগের সহিত উন্মত্ত সিপাহিদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এ দিকে বাম্‌নি প্রভুর গৃহে নিরস্ত ছিল না। তাহার প্রভু যে গৃহে অলঙ্কারাদি বহুমূল্য রত্নাদি রাখিতেন, তাহা সে জানিত; এখন সে তাড়াতাড়ি সেই সকল মূল্যবান্ আভরণ রাশি লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। কিছুকাল মধ্যে সিপাহিগণ আসিয়া সেই গৃহে আগুণ দিল। চিকিৎসক দূর হইতে দেখিলেন তাঁহার গৃহ করাল হুতাশনে ব্যাপ্ত হইয়াছে। বাম্‌নি যে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই, সুতরাং সে ইচ্ছা করিলে ঐ সকল মহামূল্য দ্রব্য অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারিত। আভরণগুলি বিক্রয় করিলে যে টাকা লাভ হইত, তাহা বাম্‌নি আপনার জীবিত কালের মধ্যে কখনই

উপার্জ্জন করিতে পারিত না; কিন্তু প্রভু-পরায়ণা অবলা এই দুষ্কর্ম্ম করিল না। সাধুতা ও প্রভুভক্তির সম্মান তাহার নিকট উচ্চতর বোধ হইল। দরিদ্রা অবলা অবলীলায় লোভ সম্বরণ করিয়া প্রভুপত্নীর সমস্ত দ্রব্য সযত্নে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

নগরের নিকটে একটি সামান্য পল্লীতে বাম্নির আবাস বাটী ছিল। বাম্নি আপনার বাটীতে আসিয়া একখানি ফ্ল্যানলের কাপড়ে আভরণগুলি জড়াইয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিল। এক বৎসরেরও অধিক কাল এই ভাবে গত হইল। এক-বৎসরেরও অধিককাল ডাক্তারপত্নীর বহুমূল্য সম্পত্তি বিশ্বস্ত বাম্নির কুটীরে মৃত্তিকার নীচে রহিল। শেষে লক্ষ্ণৌ শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইল, শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইল এবং সুখ সমৃদ্ধিতে অযোধ্যা পুনর্ব্বার শোভিত হইয়া উঠিল। চিকিৎসক আর এক সেনা-নিবাসে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বাম্নি এই সংবাদ শুনিয়া তথায় গমন করিল, এবং প্রভু ও প্রভু-পত্নীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য অন্তরাল হইতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। যখন আর কোন সন্দেহ রহিল না, তখন সে নীরবে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিল, নীরবে মৃত্তিকা হইতে সমস্ত আভরণ বাহির করিল এবং নীরবে ও সাবধানে তৎসমুদায় সঙ্গে লইয়া, পুনরায় প্রভু ও প্রভুপত্নীর নিকটে সমাগত হইল। বাম্নি অক্ষতশরীরে প্রত্যাগত হইয়াছে দেখিয়া, চিকিৎসক ও তাঁহার পত্নী বিস্মিত হইলেন। ইহার পর যখন দেখিলেন, বাম্নি তাঁহাদের পরিত্যক্ত সমুদায় আভরণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। দরিদ্র পরিচারিকা বিনম্রভাবে একে একে সমস্ত অলঙ্কার বুঝাইয়া দিল। চিকিৎসক ও তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন, অলঙ্কারাদির কিছুই অপহৃত হয় নাই। তাঁহারা পরিচারিকার এই অসাধারণ সাধুতার পুরস্কার-স্বরূপ দ্বিগুণ বেতনে পুনরায় তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। বাম্নি এইরূপে প্রভু পরিবারের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

ভারতে পাশ্চাত্য রাজাদিগের অধিকার।

প্রাচীনকালে গ্রীক এবং রোমানেরা ভারতবর্ষকে প্রায় অগম্য স্থান মনে করিত। কথিত আছে যে ব্যাকস্ নামে এক ব্যক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার অভিলাষে সসৈন্যে এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাচীন ঘটনাজ্ঞাপক কোন

টাকা, মোহর, মূর্ত্তি, স্তম্ভ, অথবা অন্য কোন প্রকার প্রমাণ না পাওয়াতে ব্যাকসের ভারতবর্ষে আগমন বিষয়ে অনেক পুরাবৃত্ত লেখক সন্দিহান হইয়া থাকেন।

সিসষ্ট্রিস নামে মিশর দেশের এক মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, কথিত আছে তিনি ভারতবর্ষ অধিকার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারও বিশ্বাস্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টীয় শকের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেমিরেমিস্ নামে এক মহা বুদ্ধিমতী ও বীর্য্যবতী রাজ্ঞী আসিরিয়া দেশের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ভারতবর্ষ জয় করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ডায়ডোরস নামে একজন অতি প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা সেমিরেমিসের যুদ্ধযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাঁহার রচিত গ্রন্থ পাঠে উপলব্ধি হয় যে আসিরিয়ার মহারাণী ঐ সেমিরেমিস্ আসিয়া মহা-দ্বীপের পশ্চিমাঞ্চল সমস্তই জয় করিয়াছিলেন, এবং ব্যাকৃট্রিয়া প্রদেশও তাঁহার অধীনস্থ ছিল।

ভারতবর্ষ জয় করিব, এই ইচ্ছার অঙ্কুর যখন সেমিরেমিসের মনে সঞ্চারিত হইল, তখন তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধির দুইটী প্রধান প্রতিবন্ধক রহিয়াছেঃ—প্রথমতঃ সিন্ধু নদ পার হইবার উপযুক্ত জলযানাদি কিছুই তাঁহার ছিলনা, দ্বিতীয়তঃ তিনি শুনিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষীয় রাজাদের বহুসংখ্যক রণহস্তী আছে, কিন্তু তাঁহার একটাও ছিল না, সুতরাং রণহস্তি-বিরহে ভারতবর্ষীয় রাজাদের সহিত যুদ্ধ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রতিবন্ধকটীর নিরাকারণার্থ রাজ্ঞী সেমিরেমিস্ ফিনিসিয়া, সাইপ্রস্ ও অন্যান্য বাণিজ্যপ্রিয় দেশ হইতে শিল্পনিপুণ ব্যক্তিগণকে আনাইয়া জলযান নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। সিন্ধুনদের তটে নৌ নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ ও অন্যান্য উপকরণ পাওয়া দুর্ল্লভ, সুতরাং ব্যাকৃট্রিয়ার রাজধানী ব্যাকৃট্রা নগরে নৌকাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল, এবং সমস্ত আয়োজন সাঙ্গ হইলে ঐ জলযানাদি উষ্ট্রপৃষ্ঠে ব্যাকৃট্রা হইতে সিন্ধু নদের কূলে আনীত হইল।

হস্তীর আয়োজন কোন প্রকারেই হইল না; অতএব সেমিরেমিস্ তিন লক্ষ বৃষ হত্যা করিতে আজ্ঞা করিলেন। সেই সকল বৃষের চর্ম্মে প্রকাণ্ড হস্তীর আকার নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে মনুষ্য ও উষ্ট্র প্রবেশ করাইলেন এবং মনুষ্যের চালনা দ্বারা উষ্ট্রের গতিতে বোধ হইতে লাগিল যেন হস্তী চলিতেছে। ঐ সকল তরি ও কৃত্রিম হস্তী প্রস্তুত করিতে সেমিরেমিসের তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। টীসিয়াস নামে একজন পুরাবৃত্ত লেখক বলেন যে সেমিরেমিসের পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা তিন লক্ষ ও

অশ্বারোহী সৈন্য পাঁচ লক্ষ। ষ্ট্রেবোবেটিস নামে ভারতবর্ষীয় রাজা সেমিরেমিসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ষ্ট্রেবোবেটিসের নৌকার সঙ্খ্যা চারি সহস্র, সেমিরেমিসের দুই সহস্র মাত্র নৌকা ছিল। সিন্ধু নদের কূলে অপর্য্যাপ্ত শর ও খাঁকড়া জন্মে, সেই শরদ্বারা ষ্ট্রেবোবেটিসের নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ ভারতবর্ষীয় রাজার সৈন্যও আসিরীয় রাণীর সৈন্য অপেক্ষা অধিক ছিল; অধিকন্তু ভারতবর্ষীয় রাজার অনেক রণহস্তী ছিল।

ষ্ট্রাবোবেটিসের সহিত সেমিরেমিসের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে সেমিরেমিস প্রথমতঃ জয়ী হইয়াছিলেন, এবং শত্রু পক্ষের অনেক নৌকা তিনি জলমগ্ন করাইলেন। সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বই আসিরীয় রাণীর হস্তগত হইয়াছিল; পরে রাজ্ঞী নদীর উপরে একটা প্রশস্ত সেতু নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা আপন সমস্ত সৈন্য পার করাইলেন। সেমিরেমিসের সৈন্য সেতু পার হইয়া গেলে পর যে আরও একটী যুদ্ধ হয়, তাহাতে ঐ আসিরীয় রাণী সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিলেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে এই সময়ে সেমিরেমিস হত হইয়াছিলেন। যাহাহউক সেমিরেমিসের পর আর কোন আসিরীয় কিম্বা বাবিলনীয় রাজা ভারতবর্ষ জয় করিতে চেষ্টা করেন নাই।

পারস্যদেশের রাজা ডেরায়স হিষ্টাস্পিস্ যিনি খ্রীষ্টীয় শকের পাঁচ শত বাইশ বৎসর পূর্ব্বে পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। সাইল্যাকস নামে ডেরায়স রাজার একজন পোতাধ্যক্ষ ছিলেন, রাজা সেই পোতাধ্যক্ষকে সিন্ধুনদের স্রোত দিয়া যাত্রা করিতে আজ্ঞা করিলেন। সাইল্যাকস রাজার আজ্ঞা পাইয়া সিন্ধু নদ দিয়া সমুদ্র যাত্রা সমাধা করিলেন। সিন্ধুনদ যে স্থানে সমুদ্রের সহিত মিলিত, সেই সাগরসঙ্গম স্থান পর্য্যন্ত সাইল্যাকস আসিয়াছিলেন। সিন্ধু নদের মুখ হইতে সাইল্যাকস আরব্য সমুদ্র পার হইয়া মিসর দেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই সমুদ্রযাত্রা সম্পন্ন করিতে তাঁহার সার্দ্ধ দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

ডেরায়স রাজা ভারতবর্ষের যে কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশের লোকেরা তাঁহাকে কাঞ্চন দিয়া কর প্রদান করিত। মুলতান ও লাহোর ভারতবর্ষের এই দুই প্রদেশের লোকেরা ডেরায়স রাজার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিল, ডেরায়স রাজার যোয়ালি আপনাদের স্কন্ধে বহন করিয়াছিল। গুজরাটও বোধ হয় ডেরায়স রাজাদ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। হেরোডোটস নামক গ্রীকদেশীয় প্রধান ইতিহাসবেত্তা ডেরায়স রাজার ভারতবর্ষ আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন এবং টিসিয়সের গ্রন্থেও তাহার বিবরণ আছে। টিসিয়সের গ্রন্থের সমুদায় অংশ পাওয়া

যায় নাই, অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই গ্রন্থের যে কিঞ্চিদংশ ষ্ট্রেসিয়স ও অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তারা রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধ সিন্ধু নদের নাম আছে, গঙ্গা নদীর নাম তাহাতে উল্লেখ নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ডেরায়স বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত আসিতে সক্ষম হন নাই।

তারকা।

(২৫৯ সংখ্যার ১২৪ পৃষ্ঠার পর।)

৪। পৃথিবীর পর মঙ্গল (Mars)। গ্রহগণের মধ্যে কেবল বুধ ও শুক্রের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষ ও সূর্য্যের মধ্যে অবস্থিত। অন্যান্য গ্রহগণের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের বাহিরে। পৃথিবীর পথের বাহিরে যে সকল গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে, তাহার মধ্যে মঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী। ইহা সূর্য্য হইতে ১৩ কোটি ১০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। আকৃতিতে ইহা পৃথিবীর প্রায় আটভাগের একভাগ। খালি চক্ষে দেখিলে মঙ্গল গ্রহকে ঈষৎ রক্তবর্ণ দেখায়। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে কাল কাল দাগ দেখা যায় এবং মেরুসন্নিহিত প্রদেশে শাদা দাগ দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রীষ্মকালে এই শাদা দাগ কমিয়া যায় এবং শীতকালে বৃদ্ধি পায়। অনেকে অনুমান করেন ঐ কাল দাগ এক একটী মহাদেশ এবং ঐ শাদা দাগ মেরু সন্নিহিত তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশ। আমাদের ৬৮৬ দিনে মঙ্গলের এক বৎসর হয়। মঙ্গলের দুইটী ছোট ছোট চন্দ্র আছে।

৫। গ্রহগণের মধ্যে (Jupiter) বৃহস্পতির আকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ১৩০০ গুণ বৃহত্তর। আমাদের চক্ষে শুক্র ভিন্ন অন্য সকল গ্রহ নক্ষত্র অপেক্ষা ইহাকে অধিক উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়। ইহা সূর্য্য হইতে ৪৭ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরবর্ত্তী। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে ইহার উপর দিয়া অনেকগুলি কাল কাল দাগ কোমরবন্ধের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অনেকে অনুমান করেন যে বৃহস্পতির চতুর্দ্দিক্ মেঘাবৃত। ঐ মেঘের জন্যই বৃহস্পতিকে এত উজ্জ্বল দেখায় এবং ঐ কাল দাগগুলি মেঘশূন্য স্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের দশ ঘণ্টায় বৃহস্পতির একবার দিবা রাত্রি হয়। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র আপনার মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে

ঘুরিয়া থাকে; এই জন্য পৃথিবী অপেক্ষা ইহার মেরু সন্নিহিত স্থান অধিক চাপা এবং বিষুব রেখার সন্নিহিত প্রদেশ অধিক স্ফীত। বৃহস্পতির চারিটী চন্দ্র আছে; উহার প্রত্যেকটী প্রায় আমাদের চন্দ্রের সমান। আমাদের ৪,৩৩৩ দিনে অর্থাৎ প্রায় বার বৎসরে বৃহস্পতির এক বৎসর হয়।

৬। শনি বা শনৈশ্চর (Saturn) সূর্য্য হইতে ৮৭ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ৭৩৪ গুণ বড়। ইহাতেও বৃহস্পতির ন্যায় কাল কাল দাগ আছে এবং উহাও মেঘের ফাঁক বলিয়া অনুমিত হয়। শনৈশ্চরের চতুর্দ্দিকে একটীর বাহিরে আর একটী এইরূপ তিনটী উজ্জল অঙ্গুরীয়বৎ চক্র উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অঙ্গুরীয় শ্রেণীর বিস্তার ৩৯০০০ মাইল, কিন্তু বেধ ১৩৮ মাইল মাত্র। অনেকে অনুমান করেন যে এই অঙ্গুরীয়কগুলি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহের সমষ্টি। এই অঙ্গুরীয়কগুলির বহির্ভাগে আটটী চন্দ্র প্রতিনিয়ত শনৈশ্চরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। আমাদের ১০,৭৫৯ দিনে অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বৎসরে শনৈশ্চর একবার সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আইসে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর পৃথিবী অপেক্ষ লঘুতর উপাদানে গঠিত।

৭,৮। ইউরেনস্ (Uranus) ও নেপচুন (Neptune) পৃথিবী অপেক্ষা এতদূরে অবস্থিত যে উহাদের সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। প্রথমটী সূর্য্য হইতে ১৭৫ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল ও দ্বিতীয়টী ২৭৪ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরবর্ত্তী। ইউরেনস্ পৃথিবী অপেক্ষা ৮২ গুণ বৃহত্তর এবং উহার চারিটী চন্দ্র আছে। নেপচুন পৃথিবীর এক শত গুণ এবং উহার একটী মাত্র চন্দ্র আছে। আজি পর্য্যন্ত সৌরজগতের যে সকল গ্রহ উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত। ইহার আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে বর্ত্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রথম প্রথম ইউরেনসের কক্ষ ও গতির এমন একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যাহা উহা অপেক্ষা দূরবর্ত্তী অন্য একটী গ্রহের আকর্ষণ ভিন্ন অন্য কোন কারণে ঘটিতে পারে না। তাঁহারা এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব গ্রহের কক্ষ, অবস্থান প্রভৃতির গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গণনা শেষ হইলে আকাশের যে স্থানে উহাকে দেখিতে পাওয়া সম্ভব বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল, সেইদিকে দূরবীক্ষণ দ্বারা অনুসন্ধান করিতে করিতে একটী নূতন গ্রহ দৃষ্টিগোচর হইল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এই আবিষ্ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ইউরেনসের বাৎসরিক গতি আমাদের ৮৪ বৎসরে ও নেপচুনের বাৎসরিক গতি আমাদের ১৬৪ বৎসরে সম্পাদিত হয়।

ধূমকেতু সম্বন্ধে বামাবোধিনীতে অনেকদিন পূর্ব্বে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, এজন্য আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এবিষয়ে আর অধিক কিছু বলিব না। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উহাদের কক্ষ অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি। এক এক সময় উহারা সূর্য্যের এত নিকটে আসে যে সূর্য্যের উজ্জল আলোকে উহারা কখনও কখনও একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়; তাহার পর উহারা আবার বহু দূরে চলিয়া গিয়া অনেক বৎসরের পর ফিরিয়া আসে। কোনও কোনও ধূমকেতু একেবারে আমাদের সৌর-জগতের বাহিরে গিয়া অন্য সৌর-জগতের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে একটী প্রকাণ্ড ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল; জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ বলেন উহা ৩০০০ বৎসরের পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিবে না।

ধারণা ও স্মৃতি।

ধারণা জন্য মনের একাগ্রতা এবং চৈতন্য সম্পাদনের প্রয়োজন। "ধারণা জন্য মনের একাগ্রতা সম্পাদন" এই বাক্যের অর্থ কি?—মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ মানসিক কার্য্য সমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। ভাব (Emotion), ইচ্ছা (Volition), এবং জ্ঞান (Intellect)। ধারণা জ্ঞানেরই এক উপবিভাগ মাত্র। যখন মানসিক শক্তি, ভাব, ইচ্ছা, কিংবা জ্ঞানের অন্যান্য উপবিভাগের কোনও কার্য্যে বিশিষ্টরূপে নিযুক্ত থাকে, তখন ধারণা জন্য তাহাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিযুক্ত রাখাকেই "ধারণা জন্য মনের একাগ্রতা সম্পাদন" বলে। মনে কর এক উগ্রমূর্ত্তি শিক্ষক শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন, আর ছাত্রগণ ভয়ে জড়সড় হইল। শিক্ষক কোনও বিষয়ের ধারণা জন্য ছাত্রদিগকে উৎপীড়ন করিতেছেন। এখানে মানসিক শক্তি "ভয়" রূপ কার্য্য সাধন জন্য ভাব বিভাগে নিযুক্ত। তাই শিক্ষক যাহা বলিতেছেন তাহা ধারণা করিবার জন্য সেই শক্তি ধারণা উপবিভাগে আসিতে পারিতেছে না। কাজেই এখানে ধারণা জন্য মনের একাগ্রতা সম্পাদন হইতে পারিল না। আবার মনে কর জননী সন্তান স্নেহে পরিপূর্ণা হইয়া বিজ্ঞানের কোন এক

গুরুতর সত্য ধারণা করিতে বসিলেন। তাঁহার ওরূপ করা বিড়ম্বনা। কারণ স্নেহ উৎপাদন করিতে যাইয়া মানসিক শক্তি ভাব বিভাগে নিযুক্ত রহিয়াছে। তবে কি করিয়া সেই শক্তি ধারণা বিভাগে আগমন করিবে? সুতরাং বিজ্ঞান সূত্র ধারণা করিবার জন্য মায়ের মনের একাগ্রতা হইল না। এইরূপ লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা ধারণা জন্য মনের একাগ্রতা সম্পাদনের অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে আমরা এখানেই ক্ষান্ত থাকিলাম। এখন দেখা যাউক ধারণা জন্য মনের চৈতন্য সম্পাদনের অর্থ কি? কঠিন পরিশ্রমের পর মন যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন মনের চৈতন্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করা মূর্খতা মাত্র। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম, বিশ্ব-নিয়ন্তার অলঙ্ঘ্য বিধি। মন সর্ব্ব সময়ে জাগ্রত থাকিতে পারে না। তবে যেমন সর্ব্বসময় নিষ্কর্ম্মা হইয়া অলসতাকে আশ্রয় করে, সেই মনের চৈতন্য সম্পাদন সম্ভবপর। কোনও বিষয় ধারণা জন্য এইরূপ অলস মনের কার্য্য প্রবর্ত্তনকেই ধারণা জন্য "মনের চৈতন্য সম্পাদন বলে"।

ধারণা জন্য মনের একাগ্রতা এবং চৈতন্য সম্পাদনের বিবিধ উপায় বর্ত্তমান—প্রথমতঃ আত্মসংযম। দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক উপায়।

আত্মসংযমের অর্থ কি? ক্রোধ, ভয়, শোক প্রভৃতি ভাব, সুখ সম্ভোগের এবং দুঃখ নিরাকরণের ইচ্ছা, স্বভাবতঃ আমাদের উপর রাজত্ব করিয়া থাকে। বিবর্ত্তনবাদী (Evolutionists) পণ্ডিতগণের মতে উহা স্বভাবজ নহে, পুরুষানুক্রমে আগত। স্বভাবজই হউক, আর পুরুষানুগতই হউক, সর্ব্বসাধারণেই উহাদের দাস। পুরুষ অপেক্ষা বালক এবং রমণীগণ, উহাদের অধিক বশীভূত। মানুষ আনুক্রমিক চেষ্টা দ্বারা এই দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই মুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সংযমের ক্ষমতা আসিয়া থাকে। ক্রমাগত চেষ্টার অন্যতর নাম সাধনা। এই সাধনা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কারণ সাধনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ মানসিক বলের প্রয়োজন। সুতরাং আপামর সকলের নিমিত্ত আত্মসংযম ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এজন্য আমরা বাহ্যিক উপায়গুলির বিষয়েই দুই চারি কথা বলিব।

যে কোন বিষয় ধারণা করিতে হইবে, তাহা সুখকর হওয়া উচিত। স্বভাবতঃও যদি উহা সুখজনক না হয়, তথাপিও চেষ্টা দ্বারা উহাকে তদ্রূপ করা বিধেয়। মনে কর কোন এক শিশুকে "ক, খ" শিখাইতে হইবে। সে "ক, খ" নীরস মনে করিবে, সুতরাং উহা ধারণা করিবার জন্য তাহার মনের একাগ্রতা হইবে না। সুতরাং করাত বা খরগোষ ক এবং খ আদ্যক্ষর থাকে

এমন দুই জিনিষের ছবির সহিত যদি বড় বড় অক্ষরে উহা লিখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ছবি দেখিবার আমোদে বালক, ক, খও অনায়াসে শিখিতে পারে। কিন্তু আমোদ জন্য মানসিক উত্তেজনা অধিক হইলে, ধারণা জন্য যথেষ্ট শক্তি থাকে না, সুতরাং "ক, খ" শিক্ষা করা দূরে থাকুক, আমোদ ভোগের জন্য বালকের মনে একটা তৃষ্ণা জন্মিয়া যায়।

বালক সহজে ধরিতে না পারিলে অনেকে বিরক্ত হইয়া পড়েন, অবশেষে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বালককে তিরস্কার করেন, প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এতদ্দ্বারা তাঁহারা বালকের সহায়তা না করিয়া বিলক্ষণ অপকার করিয়া থাকেন। বালক ধারণা জন্য যৎ-কিঞ্চিৎ যে মানসিক শক্তি আনয়ন করে, তাহাও কষ্টবোধ জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। তবে কিনা উদাসীন অলস বালককে উত্তেজনা করিবার জন্য যৎ-সামান্য শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে যত অনিষ্ট হইয়া থাকে, শাস্তি জন্য অনিষ্ট তাহা অপেক্ষা ন্যূন। সুতরাং তুলনা করিলে কথঞ্চিৎ শাস্তি প্রদানই বালকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত হিতজনক।

যে বিষয় ধারণা করিতে হইবে, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা কর্ত্তব্য, নতুবা মন তাহাতে বড় একটা আনন্দ পায় না। কাজেই মনের সম্পূর্ণ একাগ্রতা সম্পাদন অসম্ভব। বাধ্য হইয়া কোন দুর্ব্বোধ্য বিষয় ধারণা করা কাহারও পক্ষে সহজ নয়।

কোন বিষয় ধারণা জন্য মনকে একাগ্র করিতে হইলে কিছু সময়ের প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গোচরের পরক্ষণেই যদি সেই ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ দূরে সরাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মনের একাগ্রতা সম্পাদন হয় না। এজন্য হয় প্রথম গোচরকালেই পদার্থ ইন্দ্রিয় সমক্ষে কিছুকাল রাখিতে হইবে, অন্যথা বার বার তাহা ইন্দ্রিয় সমীপে উপ-স্থিত করা বিধেয়। মনে কর তুমি অভি-ধানে কর্ব্বুর শব্দের অর্থ রাক্ষস দেখিলে। এই যদি তোমার প্রথম দেখা হয়, তাহা হইলে দৃষ্টিকাল একটু অধিক হওয়া প্রয়োজনীয়। তাহা না হইলে বার বার তোমার কর্ব্বুর শব্দের অর্থ দেখিতে হইবে। যাঁহারা একবার দেখিয়াই ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই মনকে একাগ্র করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। শিক্ষা দ্বারা ঐ গুণ লাভ না করিলেও হয়ত পিতা, মাতা হইতে উহার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। ধারণা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিষয় বলিলাম, এখন স্মৃতি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

স্মরণ করিতে হইলেও মনের একা-গ্রতা সম্পাদনের প্রয়োজন। কতক-গুলি বিষয় আছে, তাহা অপর বিষয়ের স্মৃতির সহিত স্মৃতিপথে আসিয়া থাকে।

মানুষের ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, তাহা স্মৃথিপথে আসিবেই আসিবে। মনে কর এক সন্তানহারা বিধবা, মৃত সন্তানের হাতের লেখা দেখিলেন। অমনি পরলোকগত সন্তানের ছবি তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইবে। মানসিক এই নিয়ম আছে বলিয়া অনেকে সহজ স্মর্ত্তব্য বিষয়ের সহিত কষ্টস্মর্ত্তব্য বিষয়গুলি যোগ করিয়া রাখেন। যাই সহজ বিষয় স্মরণ হয়, অমনি তার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টস্মর্ত্তব্য বিষয়গুলিও স্মরণ হইয়া থাকে। মনে কর খৃষ্টান-দিগের ক্রুশ (×), এই ক্রুশ দেখিলেই তাহাদের ঈশামসীর কথা মনে পড়ে। ঈশা ক্রুশের উপর কিরূপে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। মনে কর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিমলার বিবাহ হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহও আরম্ভ হইয়াছিল। বিমলা প্রথম ঘটনার সহিত দ্বিতীয় ঘটনা সংযুক্ত করিয়া রাখিল। অবশেষে যাই বিমলার বিবাহের সন মনে পড়িবে; অমনি সিপাহী বিদ্রো-হের সনও চেষ্টাব্যতীত তাহার মনে উদয় হইবে। এইরূপে মানসিক চেষ্টা দ্বারা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

উড্ডীয়মান ভেক।

এক প্রকার মৎস্য আছে তাহা উড়িতে পারে, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ যাইতে বঙ্গোপসাগরে জাহাজ ভাসি-তেছে। থাকিয়া থাকিয়া দলে দলে উড়ুক্ মাছ উড়িতে উড়িতে ডেকে আসিয়া পড়িতেছে। সূর্য্যের কিরণে তাহাদিগের বিচিত্র বর্ণ অনেকেরই মন হরণ করিয়াছে। মৎস্য ব্যতীত উড্-ডীয়মান শৃগাল, উড্ডীয়মান কাষ্ঠবিড়াল, উড্ডীয়মান অপোজম, উড্ডীয়মান লে-মার প্রভৃতি অনেক প্রাণীর বিষয়ই প্রাণিবিজ্ঞান শাস্ত্রে পাঠ করা যায়। ঠিক অন্যান্য অবয়ব শৃগালের মত, কিন্তু পক্ষ আছে, তাহার বলে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষা-ন্তরে এবং তথা হইতে অন্য বৃক্ষে জম্বুক-রাজ উড়িয়া বেড়াইয়া থাকেন। পক্ষ-বিহীনেরই ধূর্ত্ততা ও দৌরাত্ম্যে বঙ্গের পল্লীগ্রামবাসিগণ বিব্রত; পক্ষযুক্তগণ এখানে থাকিলে না জানি কি কাণ্ড ঘটিত!

মালয় দ্বীপপুঞ্জে এক প্রকার ভেক আছে, তাহারা উড়িয়া বেড়ায়। মেঃ ওয়ালেস নামক এক ইংরাজ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে ইহাকে তরুভেক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা গাছে গাছেই বেড়াইয়া বেড়ায়। তাহার উপরেই নানা প্রকার পিপীলিকা ধরিয়া

উদরস্থ করে। জলে সাঁতার কাটিবার জন্য হাঁসদিগের চরণতল যে আকারে গঠিত, ইহাদিগের চরণতলও সেইরূপ। উহাই বিকৃত হইয়া পক্ষের কার্য্য করিতেছে। ইহারা সুবৃহৎ বৃক্ষ হইতে এই পক্ষবলে বনজাত তৃণ গুল্মে নামিয়া আসে। আবার তথা হইতে উড়িয়া আপনার তরুকোটরে গমন করে। ইহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও পৃষ্ঠদেশ উজ্জ্বল ঘন হরিতে মণ্ডিত, অন্যান্য স্থান ঈষৎ লোহিত। ওয়ালেস সাহেবকে এক চীনদেশীয় শ্রমজীবী এই প্রকার একটা ভেক বন হইতে ধরিয়া আনিয়া দিয়াছিল, তিনি উহাকে বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। এই সকল প্রাণীর বংশ দিন দিন নাশ হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতির মহা নিয়মে একদা উহাদিগকে আর আমরা জীবিত দেখিতে পাইব না। এসিয়া মহাদেশেও এক প্রকার টিকটাকি এখনও এখানে ওখানে একটা আধটা বৈজ্ঞানিকদিগের চক্ষে পড়ে, তাহারাও উড়িতে জানে। ইহাদিগের বংশ আর অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে বোধ হয়,একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। মামথ, প্লেসিওরেসস প্রভৃতি প্রাণীসকল এখন সেরূপ আর জীবিত নাই, উহাদিগের দন্ত, নখর, ছিন্ন ভিন্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন এখন বৈজ্ঞানিকগণের পরম আদরের ধন ও অশেষ বিধ তর্কের কারণস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইরূপ এই টিকটিকি প্রভৃতির দশাও যে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ এক প্রকার সর্পের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারাও উড়িয়া বেড়াইত। অল্পশিক্ষিত ইংরাজিনবিশ তাহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। তদপেক্ষা মূর্খ আবার তাহার নানাবিধ ভাবার্থ প্রকাশে বসিয়া যাইবেন। কিন্তু বিজ্ঞানে সেই ভক্তিভাজন হিন্দু ঋষিগণের কথা প্রমাণিত করিয়া দিতেছে। পর্ব্বতদেহের প্রাচীন স্তরাবলীর মধ্যে এই প্রকার সর্পের কঙ্কালাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় না; কিন্তু প্রকৃতি চির-পরিবর্ত্তনময়ী। বর্ত্তমান প্রাণীগণের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণীকূলের অবয়ব এক প্রকার ছিল না। মানবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণীর আকার কি ছিল তাহা বলিতে গেলে অনেকের অরুচিকর হইবে। কিন্তু সত্য চিরকালই সত্য।—সুরভি।

এডুকেশন গেজেটে সুরভির উপারউক্ত প্রবন্ধ উদ্ধৃত দেখিয়া গেজেটের এক পাঠক এই পত্রখানি লিখিয়াছেনঃ—

"আপনি সুরভি ও পতাকা হইতে যে 'উড্ডীয়মান ভেকের' কথা গত ২২শে শ্রাবণের এডুকেশন গেজেটে উঠাইয়াছেন, তাহাতে দেখিলাম মিঃ ওয়ালেস নামক কোন ইংরাজ ভ্রমণকারী এক প্রকার ভেকের কথা লিখিয়াছেন, যাহারা গাছে গাছেই বেড়াইয়া বেড়ায়। বোধ করি অনেকেই জানেন না, এই প্রকার ভেক আমাদের দেশেও পাওয়া

যায়। আমি ইহার দুইটী মাত্র ভেক এ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। ইহাদের শরীর দুই ইঞ্চির অধিক হইবে না। মুখটী সরু পানা। চক্ষু অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং চঞ্চল। শরীরটি অত্যন্ত কোমল, ও মেটে লাল বর্ণের সঙ্গে সাদা রং মিশাইলে যে বর্ণ হয়, সেই বর্ণ বিশিষ্ট। গাত্রের চর্ম্ম অত্যন্ত পাতলা ও স্বচ্ছ, চর্ম্ম ভেদ করিয়া গাত্রের শিরাগুলি অনেক দেখা যায়। পৃষ্ঠে মস্তক হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত কাল ও সবুজ বর্ণের কয়েকটী রেখা আছে। ইহারা গাছে গাছে উড়িয়া বেড়ায়। প্রথম দিন যখন এই প্রকার একটী ভেক দেখিয়া সতৃষ্ণনয়নে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, এমন সময় একটী প্রাচীন সেই স্থানে আসল, এবং সে এই প্রকার বেঙ আরো দুই তিনটী দেখিয়াছি, বলে। এই জাতীয় ভেকের কামড়ে বিষ আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ইহারা ছোট ছোট কীট ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং গাছে গাছেই বাস করিয়া থাকে। ইহাদের চরণ জলে সন্তরণের উপযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস। হংসচরণের ন্যায় গঠিত বটে, কিন্তু কখনও এই প্রকার জাতীয় ভেক দেখি নাই। আমার বিবেচনা হয়, এই প্রকার প্রাণীর নূতন সৃষ্টি। কালে ইহাদের বংশ বৃদ্ধি পাইবে। যে প্রকার কতকগুলি প্রাণীর বংশ লোপ পাইতেছে, আবার তেমনি কতকগুলি নূতন নূতন প্রাণীর উৎপত্তিও এ জগতে হইতেছে, সন্দেহ নাই। আমরা তাহা সহজে দেখিতে পাই না। আমি অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা কোন পুস্তকে এ প্রকার ভেকের কথা উল্লিখিত আছে দেখেন নাই। অনেক প্রাচীন লোকের নিকট অনুসন্ধান করাতে তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বে এ প্রকার বেঙ দেখেন নাই, এখন দুই একটী মাত্র দেখা যাইতেছে। স্থান-ভেদ, সঙ্গম-ভেদ, আহার্য্য-ভেদ আবাস ভেদ ইত্যাদি অনেক কারণে প্রাণিসঙ্করের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অদ্য আর একটী প্রাণির কথা জানাইতেছি, ইহাকে ভুঁই-জোনাকী বলে। অতি পূর্ব্বে এই প্রাণীটী দেখা যায় নাই। এক্ষণে ইহা অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে আরস্থলার (তেলাপোকার) ন্যায় শরীরবিশিষ্ট। পক্ষ নাই। পদগুলি পিপীলিকার পদের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। পশ্চাৎভাগ জোনাকী পোকার ন্যায় আলোকবিশিষ্ট; কিন্তু জোনাকী পোকার আলো হইতে এই আলো প্রায় তিনগুণ উজ্জ্বল ও বড় দেখায়। লোকের বিশ্বাস, ইহার গাত্র স্পর্শ করিলে পীড়া জন্মে। যে বৎসর জ্বরের বেশী প্রাদুর্ভাব হয়, সেই বৎসর এই ভুঁই-জোনাকী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।"

নিত্য পঞ্জিকা।

আশ্বিন।

১। শরতের আকাশ এত নির্ম্মল কেন! শরতের চন্দ্র ও তারকা সকলের জ্যোতি এত উজ্জ্বল কেন! আকাশের ঘনীভূত মেঘরাশি সব জলরূপে বর্ষিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া। মোহ ও পাপরাশি অশ্রুরূপে বর্ষিত হউক, হৃদয়াকাশের স্বচ্ছতা দেখিবে এবং তাহাতে প্রেমচন্দ্র ও সদ্ভাব তারকাবলী উজ্জ্বলতররূপে ফুটিয়া উঠিবে।

২। শারদীয় উৎসব সমুদায় পৃথিবীর জন্য। এখন পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই সমান দিন রাত্রি এবং শীত গ্রীষ্মের সমতা সমুদায় পৃথিবীবাসীর হৃদয়কে কেমন আনন্দে পূর্ণ করিতেছে। মানবসমাজ! এ সময় পরস্পরের মধ্যে সকল ভিন্নতা ভুলিয়া যাও এবং প্রেমভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন কর।

৩। যে জাতির জাতীয় উৎসব নাই, সে জাতি জাতিই নহে। অরণ্যবাসী অসভ্য এবং উন্নত সুসভ্য সকল জাতিই জাতীয় উৎসবে মাতিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা জাতীয় ধর্ম্মভাব, তেজস্বিতা ও সহৃদয়তা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। নরনারী বালক যুবক বৃদ্ধ সকলে জাতীয় উৎসবে আনন্দ কর, আনন্দ পরিচ্ছদ পরিধান কর, প্রেম বিনিময়ে পরস্পরের আনন্দ বর্দ্ধন কর এবং আনন্দবিধাতা পরমদেবতার পূজার্চ্চনা ও গুণকীর্ত্তন করিয়া পরমানন্দ সম্ভোগ কর।

৪। প্রীতি স্পর্শমণি, ইহা যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকে সুবর্ণ করিয়া দেয়। পৃথিবী প্রীতিময় হইলেই স্বর্গভূমি।

৫। সুখ দুঃখ তুলনাতে। জগতে যদি দুঃখ না থাকিত, সুখের মিষ্টতা কে অনুভব করিত?

৬। সদ্ভাব আপনার মধুরভাবে আপনি আনন্দিত ও উন্মত্ত—নিন্দার পরিবর্ত্তে সাধুবাদ, হিংসার পরিবর্ত্তে শুভকমনা এবং প্রহারের পরিবর্ত্তে সেবা করিতে অগ্রসর হয়। সদ্ভাবের নিকট সকলেই পরাজিত।

৭। একবিন্দু প্রেমরস পান করিলে সিন্ধুসমান অশ্রু বহিয়া যায়, তবুও আশা মিটে না। প্রেমের কি আশ্চর্য্য ভাব!

৮। সুখের সময় উন্মত্ত হইতে নাই, দুঃখ ছায়ার ন্যায় তাহার পশ্চাতে আসিতেছে।

৯। যে সুখ চায়, সে সুখ পায় না, যে দুঃখকে ভয় করে, দুঃখ আগে আসিয়া তাহাকে ধরে। সুখ দুঃখে নিরপেক্ষ হইয়া যিনি আপনার কর্ত্তব্য সাধন করেন, সুখ যাচিয়া যাচিয়া তাঁহার নিকট আইসে।

১০। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর মানবের আত্মাতেই আছেন, তাঁহার তত্ত্ব লাভ করিয়া তাঁহার সহিত প্রেমযোগে যুক্ত হইতে পারিলেই সংসারের সুখ দুঃখ অতিক্রম করিয়া নিত্য প্রেম ও শান্তির রাজ্যে বাস করা যায়।

সঙ্গীত।

ধন্য ধন্য প্রেমময় তুমি সৌন্দর্য্যের সার,
আনন্দ আকাশে সদা আনন্দে কর বিহার।
হাসিতেছ পুষ্পবনে, হাসিছ চাঁদের সনে,
শিশুর ফুল্ল আননে, কত হাসিহে তোমার।

মায়ের কোমল স্নেহে, সতীর পবিত্র প্রেমে,
সাধুর হৃদয়-ধামে, তুমি প্রেম অবতার।
তবরূপ সাগরে, মগন কর আমারে,
অমর জীবন পেয়ে, গাই মহিমা তোমার।

বাঙ্গালা প্রবচন।

(১৬৯ সংখ্যা ১১৭ পৃষ্ঠার পর)

১৫৪ খড়ের আগুণ।
১৫৫ খঞ্জনের নৃত্য দেখে চড়াই নৃত্যকরে।
১৫৬ খর নদীতে শীঘ্র চড়া পড়ে।
১৫৭ খল, যায় রসাতল।
১৫৮ খায় গালসাট মেরে, ওঠে হাঁটু ধরে।
১৫৯ খাওয়াব হাতীর ভোগে,
দেখাব বাঘের মুখে।
১৬০ খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে,
সর্ব্বনাশ করলে এঁড়েগরু কিনে।
১৬১ খাট ভাঙ্গিলে ভূমি শয্যা।
১৬২ খাবার সময় শোবার চিন্তা।
১৬৩ খায়না দেয়না পাপী সঞ্চয় করে,
তার ধন খায় চোরে আর পরে।
১৬৪ খা শত্রু পরে পরে।

১৬৫ খাল পার হয়ে কুমীরকে কলা দেখায়।
১৬৬ খাস্‌বাগানে আলকুশীর গাছ।
১৬৭ খুজরো কাজের মজরো নাই।
১৬৮ খুঁড়িয়ে বড় হওয়া।
১৬৯ খুন করিল খুনে, পরের কথা শুনে।
১৭০ খেতে পায়না চুনো পুঁটী,
হাতে দেয় হীরের আঙটী।
১৭১ খেয়ার কড়ী দে ডুবে পার।
১৭২ খেয়ে দেয়ে যায় শুতে,
বিধাতা নে যায় মূল চুরি কর্ত্তে।
১৭৩ খোঁটার বলে গাড়ল মোষে।
১১৪ খোঁড়ার পা খানায় বই পড়ে না।
১৭৫ খোদার খাসী।
১৭৬ খোরায় তিন লাথি।

* আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, লোনসিংহের বাবু রাজবিহারী দাস এবং রাজপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী বসন্ত কুমারী দাসী প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অনেকগুলি প্রবচন পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহার যথা ব্যবহার করিব। অন্য ভ্রাতা ভগিনীগণও এ প্রকার সাহায্য করিলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। একটী অনুরোধ এই, তাঁহাদিগের সংগৃহীত প্রবচন সকল অকারাদি বর্ণক্রমে সাজাইয়া পাঠাইলেই নির্ব্বাচনের পক্ষে সুবিধা হয়। বা, বো, স।

১৭৭ খোস খবরের ঝুটোও ভাল।

১৭৮ গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা।

১৭৯ গঙ্গায় মড়া এলে না।

১৮০ গঙ্গায় মলা ফেলিলে গঙ্গার মাহাত্ম্য যায় না।

১৮১ গতর নাই চোপায় দড়,
মেঙে খায় তার পালি বড়।

১৮২ গতস্য শোচনা নাস্তি।

১৮৩ গদাই নস্করী চাল।

১৮৪ গরজে গয়লা ঢিল বয়।

১৮৫ গরিবের কথা বাসি হলেই মিষ্টি।

১৮৬ গলা টিপলে দুধ ওঠে।

১৮৭ গলা নাই গান গায়,
স্ত্রী নাই শ্বশুরবাড়ী যায়।

১৮৮ গলায় পড়ে বজায় সিদ্ধি।

১৮৯ গাই নাই বলদ দুই।

১৯০ গাইতে গাইতে গান,
বাজাতে বাজাতে বান।

১৯১ গাঙ পেরয়ে কুমীরকে কলা।

১৯২ গাছে উঠতে পারে না,
বড় ছানাটী আমার।

১৯৩ গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল।

১৯৪ গাছে তুলে মই সরান।

১৯৫ গাছে তুলতে সবাই আছে,
নামাতে কেউ নাই।

১৯৬ গাছে না উঠতে এক কাঁদি।

১৯৭ গাছের খাই তলার কুড়াই।

১৯৮ গাছের কি ফল ভারী?

১৯৯ গাজনের নাই ঠিকানা,
সুধুই বলে ঢাক বাজনা।

২০০ গাধা পিটে ঘোড়া।

২০১ গাধা সব বহিতে পারে,
ভাতের কাটি পারে না।

২০২ গাল গল্প কোটা বাড়ী,
বাজার খরচ চৌদ্দবুড়ী।

২০৩ গাল বাড়ায়ে চড় খাওয়া।

২০৪ গাঁ বড় তার মায়ের পাড়া,
নাকনাই তার নত নাড়া।

২০৫ গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

২০৬ গিন্নির উপর গিন্নে পানা,
ভাঙ্গা পীড়ের আল্পানা।

২০৭ গিন্নির হাতে রাঙা পলা,
বৌয়ের হাতে সোণার বালা।

২০৮ গুটি পোকা গুটি করে,
আপনার ফাঁদে আপনি মরে।

২০৯ গুড় দিয়ে খেলে গুণচটও মিষ্টিলাগে

২১০ গুণ জ্ঞান ছ মাস,
কপালের ভোগ বার মাস।

২১১ গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে নাই।

২১২ গুরুর কথা না শোন কানে,
প্রাণ যাবে হেঁচকা টানে।

২১৩ গুরু মারা বিদ্যা।

২১৪ গেঁয়ে যুগী (ফকির) ভিক পায় না।

২১৫ গেরস্ত কাওরা শোরে কড়ী।

২১৬ গেরস্ত বলে আলুনি খেলাম,
ছাগল বলে প্রাণে মলাম।

২১৭ গেরস্তের আপদে পায়,
চাল কুটে পিটে খায়।

২১৮ গোকুলের ষাঁড়।

২১৯ গোড়া কেটে আগায় জল।

২২০ গোগাছেলের নাম তর্কবাগীশ।

২২১ গোদা পায়ে আলতা।

২২২ গোদাবাড়ী ছাঁদনদড়ী এখন তুমিকার না যখন যার কাছেথাকি তখন আমিতার।

২২৩ গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।

২২৪ গোপাল সিঙের বেগার।

২২৫ গোবর গাদায় পদ্মফুল।

২২৬ গোমড়কে মুচীর পার্ব্বণ।

২৭২ গোলে হরিবোল।

২২৮ গোলে মালে চণ্ডীপাঠ।

২২৯ গোঁপ খেজুরে।

১৩০ গোঁয়ারের মরণ গাছের আগায়।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম, শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাকে প্রথমে 'ফেল' করা হইয়াছিল।

২। বিবী এক এ লিপ্‌সকোম্ব বেথুন বিদ্যালয়ের তত্বাবধায়িকা পদ ত্যাগ করাতে কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এম এ মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়িকা এবং কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী ১০০ টাকা বেতনে তাঁহার সহকারিণী নিযুক্তা হইয়াছেন।

৩। আমরা শুনিয়া যারপরনাই বিষাদিত হইলাম, সোমপ্রকাশ পত্রের প্রতিষ্ঠাতা সুবিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। ইঁনি যেরূপ বিদ্বান, সেইরূপ বিদ্যোৎসাহী, সাধুচরিত্র, ও দেশহিতৈষী ছিলেন।

৪। গত ১৯এ আগষ্ট মহারাণী নূতন পার্লেমেণ্ট সভা খুলিয়া একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়াছেন।

৫। গবর্ণমেণ্ট বহরমপুর কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করাতে মৃত মহাত্মা অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীর বনিতা রাণী আর্ণাকালী উক্ত কলেজের সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এক লক্ষ টাকা মূল্যের একটী জমীদারী দান করিবেন। এ সামান্য রাজকীয় বদান্যতা নহে।

৬। মেরি এলিজাবেথ কুক নাম্নী একটী মার্কিণ রমণী জাহাজের কাপ্তেনী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার স্বামী ইঁহারই অধীনে সেই জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার আছেন।

৭। কোহিনুর (অর্থাৎ আলোর পর্ব্বত) নামক হীরার চতুর্গুণ এক খণ্ড হীরা লণ্ডন প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়াছে। এই হীরা খণ্ডটীকে ভিক্টোরিয়া নাম দিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে উপহার প্রদত্ত হইবে।

৮। গতবর্ষের ন্যায় এ বৎসরও বন্যার ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চল প্রায় সমস্তই প্লাবিত। ঢাকা, ফরিদপুর, ময়-

মনসিং, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, হবিগঞ্জ প্রভৃতি সমস্তই জলে ভাসিতেছে। ব্রহ্মরাজ্যের ঘোর দুর্দ্দশা। আসামেও ব্রহ্মপুত্র উচ্ছ্বাসিত। অনেক প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। লোকের গৃহদ্বার, জল মধ্যে দ্বীপাকারে ভাসিতেছে।

৯। নিউজিলাণ্ডের আগ্নেয়গিরি হইতে বহুল পরিমাণে অগ্ন্যুদ্গম আরম্ভ হইয়াছে। টিরাওয়েরা পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে ২১০০০ ফুট উৰ্দ্ধ পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা প্রবল বেগে উঠিয়া থাকে। উহা বিস্তারে ১.৩ মাইল হইতে ২ মাইল পর্য্যন্ত।

১০। অষ্ট্রীয়ার মহারাণী সর্ব্বদা ব্যায়ামক্রীড়া ও অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেন, এজন্য দুরারোগ্য পীড়াক্রান্ত হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। উদ্গাথা—শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রি প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। উদাত্ত ভাব পূর্ণ পরমার্থ তত্ত্ববিষয়ক কবিতাবলী। ঈশ্বরের মহান্ ভাব, আত্মচৈতন্য এবং ব্রহ্মানন্দ উদ্বোধের পক্ষে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বিশেষ সহায় হইবে।

২। গৃহিণীর কর্ত্তব্য—শ্রীআনন্দ চন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত, মূল্য ॥৶০ আনা। ইহাতে গৃহ, সময় ও শ্রম, পতির প্রতি কর্ত্তব্য, মিতব্যয় ও সঞ্চয়, পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য, রন্ধন ও পরিবেশন, অতিথি ও অভ্যাগতগণের প্রতি কর্ত্তব্য, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য, সন্তানপালন ও সন্তানের শিক্ষা এই দশটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গরমণীরা যাহাতে গৃহিণী হইয়া পতি পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গকে সুখী করিতে পারেন, সেই উদ্দেশেই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক বঙ্গমহিলা ইহা পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের শুভ উদ্দেশ্য সফল করুন। বঙ্গ সাহিত্য সমাজে এরূপ পুস্তকের সমুচিত সমাদর হওয়া আবশ্যক।

৩। বাঙ্গালীর ইউরোপ দর্শন—বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তকখানি ২৫২ পৃষ্ঠা পরিমিত, অতি সুন্দর অক্ষরে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালীর দৃশ্য সকলের সুন্দর চিত্র আছে এবং সেই চিত্র সকল হৃদয়গ্রাহী ও কৌতূহলোদ্দীপক। এরূপ দেশভ্রমণ বিষয়ক পুস্তকসকল যত প্রচার হয়, ততই ভাল।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১।০ আনা। গিরিজাপ্রসন্ন বাবু ইতিমধ্যে গ্রন্থকার বলিয়া প্রশংসিত। তিনি বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের চিত্র সকল উজ্জ্বল ভাষায় পাঠকদিগের নিকট ধারণ করিবার জন্য

প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং বঙ্কিমবাবুও তাঁহার এ চেষ্টার অনুমোদন করিয়াছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসের সৌন্দর্য্যপূর্ণ বঙ্কিমচন্দ্র যে বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের বিশেষ প্রীতিকর হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

৫। পরেশ প্রসাদ—একজন পরিব্রাজক প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এই উপন্যাসপ্রণেতা একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। তদ্রচিত শৈলবালা সাহিত্য সমাজে বিশেষ সমাদৃত। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এই উপন্যাস খানিতে গ্রন্থকর্ত্তার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুন্ন রহিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের বিশেষ গুণ, এই যে, তিনি সুরুচিসম্পন্ন রচনা প্রচারের পক্ষপাতী। পাঠিকারা এই পুস্তক পড়িলে আমোদিত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

৬। মায়াবিনী—শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু বিরচিত। এই কবিতা পুস্তকে সুন্দর সুন্দর কবিতা নিবদ্ধ আছে। ইহা পাঠে গ্রন্থকারের হৃদয়বত্তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাণ মুদ্রাঙ্কণও উৎকৃষ্ট।

বামাগণের রচনা।

আশীর্ব্বাদ।

১

ভ্রাতা ভ্রাতৃজায়া আজ মিলিত হইল,
আনন্দ প্রবাহে মন ভাসিয়া চলিল।
কি দিব আশীষ চিহ্ন ভাবিয়া না পাই
নয়নে দেখিয়া আজ সপত্নীক ভাই,
রত্নাকর গর্ভে রাজে রতন নিকর,
খনি মাঝে শোভা পায় হীরক সুন্দর,
শোভা পায় স্বর্ণবিজড়িত চুণি মণি
এসব আশীষ চিহ্ন তুচ্ছ বলে গণি।
খুলিয়া হৃদয় দ্বার মন প্রাণ ভরি
চিরদিন সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি।

২

রজনীর সহ যবে মিলে শশধর,
স্নিগ্ধ কিরণ রাশি ছড়ায়ে সু-ধীরে
সন্ধ্যাভাগে গিরিচূড়া প্রাসাদ উপর
খেলা করে, চুম্বে কভু উচ্চ বৃক্ষ শিরে,
ক্রমে ধীরে ধীরে নামে শুভ্র কররাশি;
জগত রজত বেশে,নীরবেতে উঠে হেসে,
সেই হাসি অনন্ত হাসিতে যায় মিশি,
এইরূপে প্রেম উপদেশ মনে ধরি
চিরদিন সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি।

৩

এই যে কৌমুদী রাশি দেখিতেছ নিরমল,
মনে রেখ ভাই! ইহা প্রেমের আদর্শস্থল।
এই অকলঙ্ক কর সম ক্রমে ধীরে ধীরে
তোদের প্রেমের ছায়া পড়ুক অনন্তশিরে।
প্রেমের প্রথম শিক্ষা জগতে দম্পতীপ্রেম,
সেপ্রেমে শিক্ষিত হও মেঘের প্রসন্ন যেম,

প্রেমের দ্বিতীয় শিক্ষা বিশ্বের প্রেমেতে ভাই'
ঈশ্বর করুন বিশ্বপ্রেমিক তোদের তাই,
তৃতীয়ে অনন্তপ্রেম সেপ্রেমে প্রেমিক হও
নিষ্কলঙ্ক প্রেমে যেন কভু কলঙ্কিত নও,
শিখিতে অনন্ত প্রেম কর হাত ধারাধরি,
চিরদিন সুখে থাক এই আশীর্ব্বাদ করি।

৪

বিশাল পাদপে যথা সঞ্চারিণী লতা,
হউক জড়িত প্রসন্নেতে হেমলতা,
প্রেমময়! তব কাছে এই ভিক্ষা করি,
শিখুক প্রেমের শিক্ষা এই নর নারী।
এই তরুলতা নাথ আজ এ সংসারে
জড়িত হইল তব প্রেম শিখিবারে,
কোন ঝঞ্ঝাবাতে যেন বৃক্ষ না উপাড়ে,
কৃতান্ত বায়ুতে যেন লতা নাহি ছিঁড়ে।
জুড়াল নয়ন দোঁহে দেখে আহা মরি,
চিরদিন সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি।

শ্রীকুমুদিনী
যশোহর।

আমার দেবতা।

নামিল সুখদা সন্ধ্যা এভব ভবনে,
হইল জগৎ-চিত
নব ভাবে বিকশিত,
উজলিল শশধর সুনীল গগনে। ১

হাসিল ঘুমন্ত শিশু সুধা ছড়াইয়া,
স্মরণ-অমিয় রাশি
অধরে উঠিল ভাসি;
জননী চুম্বিলা তারে পুলকে ভরিয়া। ২

ঘরে ঘরে দীপ মালা জ্বলিল সঘনে;
জগতের নর নারী
প্রণমে বিভুরে স্মরি,
আমিও প্রণমি নাথে বসি এ বিজনে। ৩

যেখানে সেখানে থাক, ধর এ প্রণাম,
প্রাণের পিপাসা এই,
আর কোন আশা নেই,
জানিনে এ উপাসনা সকাম নিষ্কাম। ৪

সাধে কি তোমারে পূজি বসি নিরজনে?
সাধে কি সতত প্রাণ,
করে সেই গুণ গান,
সাধে কি মনের সাধে পড়ি ও চরণে? ৫

আমি যা দেখেছি সে কি নিশির স্বপন?
সে মুখ ত্রিদিব আশা,
অপার্থিব ভালবাসা,
সব কি কথার কথা?—না না না কখন। ৬

সে সব ভুলিলে বিশ্ব জড়পিণ্ড হয়,
অরুণের আলো রাশি,
চাঁদের মধুর হাসি,
ফুলের ললিত ছটা জড় বই নয়। ৭

কি নিয়ে রহিব ভবে হ'য়ে তোমা হারা?-
এ কায় মাটীর কায়,
তুমি নিত্য আত্মা তায়,
তোমা লাগি শোক অশ্রু, প্রেম-অশ্রু-
ধারা। ৮

যে বলে বলুক, তুমি এ জগতে নাই—
আমি তো তোমারে হেরি
অযুত নয়ন ভরি,
অযুত পরাণে মরি! চরণে লুটাই, ৯

অই যে ভাসিছ তুমি নৈশ সমীরণে,
অই যে চাঁদের কোলে
তব চন্দ্রানন দোলে!
এই যে জাগিছ তুমি আমার নয়নে। ১০

গাইছে বিহঙ্গ বালা তুলিয়া লহরী,
বাগানে ফুটিছে ফুল,
হাসিছে জোনাকী কুল,
ভুবন ভরেছে মরি! তোমার মাধুরী। ১১

মিছে খুঁজিয়াছি আগে কোথা তুমি* কয়ে,
এখন দেখিনু তাই
তোমা ময় সব ঠাঁই,
তুমিই রয়েছ সদা বিশ্বময় হ'য়ে! ১৩

আবার প্রণমি আমি ধর আর বার,
(কিবা দিব উপহার—
দিতে কি বা আছে আর,
অশ্রুধারা বিনা আজি কি আছে আমার?) ১৪

কেন যে প্রণমি আমি কি বুঝিবে পরে?
কেন যে তোমার নাম,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ধাম,
সেই জানে শুধু, তুমি জানায়েছ যারে! ১৫

মিটায়ে মনের আশা নিত্যই পূজিব,
কাজ নাই চতুর্ব্বর্গ,
চাই নে দ্বিতীয় স্বর্গ,
অনন্ত স্বরগ তুমি! তোমারে নমিব। ১৬

যে বলে বলুক তুমি ধরাতলে নাই,
শুধু কিরে বঙ্গবালা,
খুলিয়াছে কণ্ঠমালা,
সাধে কি হয়েছে কবি কে বুঝিবে তাই? ১৭

তথাপি যদিও তুমি স্বরগে উদয়
তবু তব প্রেম-গীত
ভারত-পূরিত নিতি,
আমার হৃদয়ে তুমি অমৃত অক্ষয়! ১৮

প্রিয় প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

* প্রিয়প্রসঙ্গ ১২৩ পৃষ্ঠা।

সতীত্ব ভূষণ।

কি ছার সে মহিলার স্বর্ণ অলঙ্কার,
কি ছার তাঁহার গলে মুকুতার হার,
কি ছার সে কমনীয় কুন্তল বিন্যাস,
কি ছার তাঁহার গাত্রে বহু মূল্য বাস,
কি ছার তাঁহার পক্ষে অর্থ অগণন,
কি ছার তাঁহার পক্ষে মহিষী-আসন,
সতীত্ব ভূষণে যাঁর ভূষিত হৃদয়,
তুচ্ছ তাঁর কাছে বেশ ভূষা সমুদয়।

কি করিবে বাহ্যরূপে ললনা তাঁহার,
ভিতরে স্বর্গীয় রূপ প্রকাশে যাহার?
কোকিলের কালরূপে কিবা আসে যায়,
শাল্মলী পুষ্পের বল আদর কোথায়?
ধন্য সে মহিলা যাঁর সতীত্ব ভূষণ।
দেবতার পূজ্য সেই রমণী রতন।

শ্রীসুমতি মজুমদার
দরভাঙ্গা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬১ সংখ্যা | আশ্বিন ১২৯৩—অক্টোবর ১৮৮৬। | ৩য় কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জলপ্লাবন—গত বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিম বঙ্গের স্থানে স্থানে জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং গত বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও পূর্ব্ব-বাঙ্গালা রেলওয়ে স্থানে স্থানে অগম্য হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য যাত্রীদিগকে জলযানে পার করিতে হইতেছে। বৎসর বৎসর এরূপ দুর্ঘটনা হইলে বড়ই ভয়ের বিষয়।

বিকৃত ঘৃত—এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেকগুলি আবেদন পত্র যাওয়াতে বড় লাট সাহেবের আদেশে ছোট লাট সাহেব অকালে ব্যবস্থাপক সভা আহ্বান করিয়াছেন এবং খাদ্য দ্রব্য মাত্রে ভেজালের বিরুদ্ধে আইন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা আশা করি শীঘ্র একটা সুবিধা হইবে।

প্রদর্শনী—বিলাতে ভারতবর্ষীয় ও ঔপনিবেশিক দ্রব্যের প্রদর্শন গত মে মাসে আরম্ভ হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। এক ছুটীর দিনে ৮১০০০ লোক এই মেলা দেখিতে যান, ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ দর্শক সংখ্যা কত হইবে ভাবিয়াদেখ। ভারতবর্ষের কৃষিজাত প্রদর্শনার্থ একজন বাঙ্গালী

তথায় আছেন। (২) এডিনবর্গে নূতন যন্ত্রের প্রদর্শনী চলিতেছে, মহারাণী স্বয়ং তাহা খুলিয়াছেন। (৩) আগামী বর্ষে নিউ কাসলে কয়লার প্রদর্শনী এবং মাঞ্চেষ্টারে সাধারণ প্রদর্শনী হইবে। (৪) ১৮৮৮ সালে নিউ সাউথ ওয়েলসের বিক্টোরিয়া নগরে এক মাহা প্রদর্শনী হইয়া ৫০ বৎসরে অষ্ট্রেলিয়ার কত উন্নতি হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া হইবে। দর্শকদিগের সুবিধার জন্য একহাজার ফিট উচ্চ এক মঞ্চ নির্ম্মিত হইবে। (৫) ফরাসীরা তাহাদের রাষ্ট্রবিপ্লবের স্মরণার্থ ১৮৮৯ সালে এক শত বার্ষিক মেলা করিবে।

অগ্ন্যুৎপাত—নিউজিলণ্ড দ্বীপ উত্তর ও দক্ষিণ দুই দ্বীপখণ্ডে বিভক্ত। উত্তর খণ্ডে একটী সুন্দর হ্রদ ও তাহার ভিতর সুদৃশ্য পাহাড় ছিল। অগ্ন্যুৎপাতে এই পাহাড় বিদীর্ণ হইয়া এত ধাতু নিঃস্রব হইয়াছে যে নিকটবর্ত্তী স্থান সকল ৮ ফিট উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

নূতন রেলওয়ে—আমেরিকার কানেডা হইতে বাঙ্কোবর দ্বীপ পর্য্যন্ত এক রেল পথ প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা সুউচ্চ রকী পর্ব্বত ভেদ করিয়া ও উইনিপেগ হ্রদের তীর দিয়া আসিয়াছে। ইহা দ্বারা ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ও অষ্ট্রেলিয়াতে আসিবার বিশেষ সুবিধা হইল।

দলিপসিংহ—জনরব উঠিয়াছে, দলিপসিংহ এডেন হইতে পলাইয়া রুসিয়াতে গিয়াছেন এবং ত[...] সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। দলিপসিংহ এক্ষণে জর্ম্মণিতে বাস করিতেছেন।

গার্টেন কলেজ—ইংলণ্ডে এই উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা কলেজের সুফল দেখিয়া সাধারণে চমৎকৃত হইয়াছেন, ইহার অনেক ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত গৃহের জন্য কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ৬০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বেথুন স্কুল—কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এবং কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী দ্বারা এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা কার্য্য বেশ চলিতেছে, আমরা আশা করি ইহাদিগকে বর্ত্তমান পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করা হইবে। হাইকোর্টের নূতন প্রধান বিচারপতি এবং তাঁহার গুণবতী পত্নী এই বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ যত্নের পরিচয় দিতেছেন। কুমারী কামিনী সেন বি এ এবং সরলা মহলানবিস বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন।

বঙ্গমহিলা সমাজ—এই সভার নূতন বৎসরের কার্য্য উৎসাহের সহিত আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে :—সমাজ সংগঠনে স্ত্রীগণের সহকারিতা, (২) আত্মোৎসর্গ, (৩) হিমাচল ভ্রমণ।

সুমাতা ও উচ্চ শিক্ষা—গত আগষ্ট মাসে ব্রাইটন নগরে ব্রিটিষ মেডিকেল আসোসিয়েসনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি বলেন স্ত্রীলোকেরা উৎকৃষ্ট মাতা হইতে পারিলে আর উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই। তাঁহার এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় মস্তিষ্কের উপর যেরূপ অতিরিক্ত পীড়ন হয়, তাহার ফল মন্দ সন্দেহ নাই। কিন্তু তা বলিয়া স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষার পথ রোধ করিতে যাওয়া কুসংস্কার। আমরা বলি সুমাতা ও উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা একত্র না হইলে সমাজের সম্যক্ কল্যাণ সাধিত হইবে না।

হিতৈষিণী বিদেশিনী—মান্দ্রাজের গবর্ণর পত্নী লেডী গ্রাণ্ড ডফ দাক্ষিণাত্যের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক উৎসাহ দান করিতেছিলেন এক্ষণে এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। বঙ্গদেশের স্ত্রীজাতি হিতৈষিণী বিবী ইলবার্টও আগামী নবেম্বরে বিলাত যাত্রা করিবেন। তাঁহার সুযোগ্য স্বামী পার্লেমেণ্ট সংক্রান্ত একটী উচ্চ কর্ম্ম পাইয়াছেন।

সতী রমণী—(১) পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের একজন দুর্বৃত্ত ফিরিঙ্গী গার্ড একটী দেশীয় রমণীর সতীত্ব নাশের চেষ্টা করায় তিনি রেলগাড়ী হইতে লাফ দিয়া পড়েন। ঈশ্বরেচ্ছায় স্ত্রীলোকটীর মান ও প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, গার্ড বিচারাধীন আছে। (২) দাক্ষিণাত্যে এক চিতাবাঘ এক ব্যক্তিকে লইয়া যায়, তাহার বীরভার্য্যা এক অস্ত্র লইয়া বাঘকে তাড়া করিয়া নিহত করেন এবং স্বামীকে তাহার মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। দুঃখের বিষয় স্বামীর দেহ বাঘের নখ দন্তাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হওয়ায় তিনি পরদিবস মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন।

ঐশ্বর্য্য।

ঐশ্বর্য্যের কি মোহিনী শক্তি! কি চাক্‌চিক্য! একবার দেখিলে পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা হয়। ধনাঢ্যের অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর নয়ন ফিরাইতে মন সরে না। অনিমেষ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু দরিদ্রের কুটীরের দিকে একবার তাকাইলে আর দ্বিতীয় বার তাকাইতে সাধ হয় না। ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। ধনীর সুরম্য প্রাসাদ শ্রবণ-সুখকর গীত বাদ্য ধ্বনিতে নিরন্তর

মুখরিত, দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর ক্ষুৎ-পীড়িত সন্তানগণের আর্ত্তনাদে সতত আকুলিত; ঐশ্বর্য্যশালীর চল-বীজন-সেবিত হর্ম্ম্যাভ্যন্তরে রজনীযোগে স্ফটিকালোক সমুজ্জ্বলিত হইয়া দিবসের গর্ব্ব খর্ব্ব করে, নির্ধনের রুদ্ধবায়ু অপ্রশস্ত কুটীর মধ্যে প্রদীপ্ত দিবাভাগেও অন্ধকার রাজত্ব করিতে থাকে। ধনীর ভবন নানাবিধ বিচিত্র-দৃশ্য বহুমূল্য বস্ত্রাদি-শোভিত; দরিদ্রের বাস-স্থানে শত-গ্রন্থি মলিন বস্ত্র খণ্ড কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করে। এক স্থলে আলস্য ও শ্রম-শূন্যতা; অন্যত্র প্রাণান্ত পরিশ্রম; একদিকে অপরিসীম মান সম্ভ্রম, অন্যদিকে অকথনীয় উৎপীড়ন ও নিষ্ঠুরাচার; ধনবানের ইচ্ছা, ইঙ্গিত মাত্র তৎক্ষণাৎ শত দিক হইতে পূর্ণ হইয়া থাকে, হতভাগ্য নির্ধন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াও আপন উদরান্ন সংগ্রহ করিতে অসমর্থ।

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এতদূর আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখিয়া কে না ধনী হইতে ইচ্ছা করে? সম্পদ লাভের বাসনা কাহার না মনে জাগ্রত হয়? কিন্তু এই যে সম্পদ বা ঐশ্বর্য্যের কথা বলিলাম, ইহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। জ্ঞানিগণ ইহার জন্য লালায়িত হন না। কমলা যে সতত চঞ্চলা, তাহা ইঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই চঞ্চলা দেবীর আরাধনায় বিশেষ কিছু ফল নাই—কেন না, তিনি প্রসন্ন হইলেও তাঁহার জন্য মানুষকে সর্ব্বক্ষণ উৎকণ্ঠিত থাকিতে হয়। ধনে কিয়ৎ পরিমাণে বাহ্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু স্থায়ী মানসিক সুখ ব্যতীত মনুষ্য কখনই প্রকৃত সুখে সুখী হইতে পারে না। যথার্থ সুখের আকর দুইটী—জ্ঞান ও ধর্ম্ম। জ্ঞানের বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিবার এস্থলে প্রয়োজন নাই। পাঠশালার বালক বালিকা পর্য্যন্ত জানে,—

"মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন।
সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন॥
এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।
জ্ঞানের প্রদীপ মনে নাহি জ্বলে যার;
কখন ঘুচেনা তার ভ্রম-অন্ধকার"

ইত্যাদি।

চাণক্য পণ্ডিত লিখিয়া গিয়াছেন—"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" রাজা কেবল স্বদেশেই পূজ্য, কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি সর্ব্বত্রই পূজার্হ।

ভগ্নীগণ! তোমরা আজি পুরুষের খেলার বস্তু হইয়া রহিয়াছ। তাহার প্রত্যেক আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্যই যেন তোমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এখন তোমরা আর গৃহলক্ষ্মী নও, কিন্তু সামান্য পরিচারিকা মাত্র। এখন তোমরা আর সিংহাসনারূঢ়া দেবতা নও। কবি এক্ষণে প্রাণ খুলিয়া গাহে না,—

"জগতে তুমি জীবিতরূপিণী,
জগতের হিতে সতত-রতা,
* * *
হতো মরুময় সব চরাচর,
তুমি না থাকিতে জগতে যদি"
ইত্যাদি।

কিন্তু তোমাদের ইউরোপীয়া ভগিনী—গণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর দেখি তাঁহাদের কত মান, সম্ভ্রম! তাঁহারা যখন পথ দিয়া একাকিনীও চলিয়া যান, তখন লোকে তাঁহাদের উপর কোনরূপ বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে সাহস করে না। অনেকে বলিতে পারেন, ইংরেজ রমণীগণ রাজার জাতি, তাই তাহাদের উপর কেহ কিছু বলিতে সাহস করে না। বাস্তবিক একথা যথার্থ নহে; তাঁহাদের স্বদেশে তাঁহারা সকলেই ত রাজার জাতি, কিন্তু সেখানেও ত মহিলাগণের প্রতি কোন দুষ্ট লোক অসম্মান প্রদর্শন করিতে সাহসী হয় না। আর, আমাদের রমণীগণ পথে বাহির হইলে, দুষ্ট লোকের ভ্রুকুটি ও ব্যঙ্গ বাণ তাহাদের উপর অমনি বর্ষিত হইতে থাকে। সঙ্গের পুরুষ অনেক সময় ইহার প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হন না। তখন, "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন। ইহার কারণ, আমাদের দেশীয় পুরুষ-গণের প্রকৃত শিক্ষার সুফল আজিও ফলে নাই। আচার ব্যবহারের যেরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক, তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াও কার্য্যে পরিণত করিতে আজিও কেহই সাহসী হইতেছেন না। পুরুষ জাতি যত দিন উন্নত না হইবে, ততদিন তোমাদের উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র।

শিক্ষার হীনতার সঙ্গে সঙ্গে তোমা-দের ধর্ম্মের লাঘব ঘটিয়াছে বলিয়া, (তোমরা আর্য্যনারী হইলেও) ধর্ম্মের দুএকটী কথা এস্থলে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহাও আমাদের নিজের দোষে। আমরা বিদেশীয় ভাষা শিখিয়াছি, বিজাতীয় ভাব অনুসরণ করিতেছি, হিন্দু ধর্ম্মের অনেক বিষয় কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছি। কিন্তু তাহার পরি-বর্ত্তে তোমাদের হৃদয়ে কোনরূপ ধর্ম্মের উচ্চভাব রোপণ করিতেছি না। ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ ধারণ করা। প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ সুখ, দুঃখে স্থির ও অবিচ-লিত থাকেন। সুখের সময়, সম্পদের সময়, একেবারে উল্লাসে উন্মত্ত হন না, দুঃখ ও বিপদে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়াও পড়েন্ না। পৃথিবীর সহস্র কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া, যখন তাঁহারা হৃদ-য়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে প্রার্থনা ধ্বনি উত্তোলিত করিয়া ইষ্ট দেবতাকে ডাকিতেথাকেন, তখন তাঁহাদের দুঃখাশ্রু সুখাশ্রুতে পরিণত হয়, হৃদয় অলৌকিক বলে দৃপ্ত হইয়া উঠে।

পাতিব্রত্য বঙ্গরমণীকুলের বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত আছে। সন্তান বাৎ-

সল্য তাঁহাদের আর একটী ধর্ম্ম। এই দুইটী লইয়া নারীজীবন। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম যে কেবল পতির প্রতি অচলা ভক্তি থাকিলেই হইল, তাহা নহে; অধিকন্তু পতির দোষ সংশোধন করা, নিরাশার সময় আশা দেওয়া, শোকে শান্তি ও সৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করা পত্নীর কর্ত্তব্য। পত্নী যে কেবল সম্বন্ধে স্ত্রী তাহা নহে, কিন্তু "সৌহার্দ্দ্যে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।" সন্তানবাৎসল্য যে কেবল কায়িক ও মানসিক শ্রম দ্বারা নিঃস্বার্থ ভাবে সন্তানদিগের লালন পালন করে তাহা নহে, কিন্তু যাহাতে সন্তানগণ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তোমরা শিক্ষিতা না হইলে সন্তানপালন ও পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে না। জ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন। জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্ম অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে পরিণত হয়। আবার ধর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান মনুষ্যকে অবিশ্বাসী বা অল্প বিশ্বাসী এবং অনেক স্থলে হৃদয়শূন্য করে। এ সংসারে মনুষ্যজীবনে যতদূর সুখলাভ সম্ভবপর, অবিশ্বাসীর ভাগ্যে তাহা ঘটে না। সময় সময় তিনি দুঃখ শোকে অধীর হইয়া পড়েন। নিরাশা আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলে।

ঐশ্বর্য্য শব্দটী—"ঈশ্বর" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা মানবকে ঈশ্বরের সমীপে লইয়া যায়, তাহাই ঐশ্বর্য্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। ধর্ম্ম ও জ্ঞান এ পথের প্রধান সহায়। ইহারাই সকল ঐশ্বর্য্যের সার ঐশ্বর্য্য সংসারের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্বদেশে কি বিদেশে, সজনে কি বিজনে, পর্ব্বতশিখরে কি সাগরবক্ষে, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকগণ চিরস্থায়ী সুখ লাভ করেন। কিন্তু এরূপ সুখ ধনীর ভাগ্যে অল্পই ঘটে। ধনের বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া, যদি সম্ভোগ করিতে তোমাদের ইচ্ছা হয়, তবে একবার স্বভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, শোভার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাইবে। সূর্য্যের প্রদীপ্ত প্রভার নিকট ধনী গৃহের অসংখ্য দীপালোক চিত্রাঙ্কিতবৎ বলিয়া বোধ হয়। যখন শরৎকালের মেঘশূন্য সুনীল আকাশে শশধর সমুদিত হইয়া, জ্যোৎস্না তরঙ্গে জগৎ প্লাবিত করেন, তখন কোন্ হতভাগ্যের হৃদয় সুখ শান্তিতে পূর্ণ না হয়? যদি তোমরা সঙ্গীত শ্রবণ করিতে অভিলাষ কর, তাহাহইলে, তোমাদের কর্ণকে অভ্যস্ত কর, প্রকৃতির গায়ক কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুলের মধুর কাকলী পূর্ণ গীতধ্বনিতে তোমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইবে। ধনীর ভবনে এসকল কিছুই নাই। সেখানে সকলই ভেল। তথাকার ঐশ্বর্য্য প্রকৃতির এইরূপ ঐশ্বর্য্যের তুলনায়

কিছুই নহে। এই সম্পদ লাভ তোমাদেরই আয়ত্ত। তোমাদের ঈশ্বর এই গুলি তোমাদের জন্য অবারিত রাখিয়াছেন।

অবস্থা ও সংসার।

সকলের অবস্থা সমান নহে। সাধারণ কথায় কাহারও আয় অধিক কাহারও বা আয় অল্প। কেহ আয় হইতে আবশ্যক ব্যয় করিয়া কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারে, কাহারও বা আয় ব্যয়ে কুশল হয় না। কেহ ১০০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া ৫০ টাকা সঞ্চয় করিতে পারে, কেহ বা ৫০০ টাকা আয় সত্ত্বেও ঋণগ্রস্ত। ইহার দুইটী কারণ আছে, উহাদের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে যথার্থ ব্যয় কাহাকে বলে তাহাই বলিব। শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক স্বচ্ছন্দতা ও উন্নতিহেতু যে অর্থ ব্যয় বা দ্রব্যের বিনিময় করিতে হয়, তাহার নাম যথার্থ ব্যয়। শরীর-পোষণে, বিদ্যা উপার্জ্জনে, দেশাচারানুমোদিত সদ্ভাবপোষককার্য্যে ও ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে ব্যয় আছে। প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে এ ব্যয় ন্যায্য। কিন্তু প্রকৃতি অনুসারে এই ন্যায্যতায় বিভিন্নতা হয়। বায়ু সেবন সকলের পক্ষে স্বাস্থ্যকর;— কেহ পদব্রজে, কেহ বা ঘোড়া বা গাড়ী চড়িয়া সেই বায়ু সেবন করুন; উভয়েরই উপকার দর্শিবে। কাহার কত উপকার, তাহার মীমাংসা করিবার আপাততঃ প্রয়োজন নাই। এই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতেছে যে একই কার্য্যহেতু এক ব্যক্তির ব্যয় নাই, অপরের ব্যয় আছে। অন্যান্য দৃষ্টান্ত লইয়া এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে যে ব্যয় একজনের পক্ষে ন্যায্য বলিয়া বিবেচিত, অপরের পক্ষে তাহা অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং ন্যায্য ব্যয়, অনাবশ্যক ব্যয়, ও অপব্যয় বা অন্যায় ব্যয়, ঐ সকল কথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। যাঁহারা অধিক আয় প্রযুক্ত অনাবশ্যক ব্যয় করেন অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত না হইয়া অপব্যয় করেন, তাঁহারা ভাল কাজ করেন না সত্য, কিন্তু যাঁহারা আয়ের অকুলানে ঐরূপ অনাবশ্যক ব্যয় করেন, তাঁহারা অধিক অপরাধী। অতএব ঋণগ্রস্ত হইবার একটী কারণ অপব্যয়। দ্বিতীয় কারণ প্রকৃতপক্ষেই অকুলান। ১০০ টাকা বেতনে ৫টী পরিবার প্রতিপালন করা এক কথা, ঐ আয়ে ২০টী পরিবার প্রতিপালন করা ভিন্ন কথা। ৫টী পরিবার লইয়া হয়ত এক ব্যক্তি অপ-

ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত, অপর ব্যক্তি অপব্যয় না করিয়াও ২০টী পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে ঋণগ্রস্ত, সুতরাং ঋণগ্রস্ত হইবার ছইটী কারণ উল্লিখিত হইল। যে যেমন অবস্থার লোক হউন না কেন, ঐ দুই কারণে দারিদ্র্য বশতঃ ক্লেশ পাইতে পারেন। কারণ অকুলান হইলে ত কথাই নাই, আর অর্থ যতই থাকুক না কেন, অপব্যয়ের শেষ নাই—ক্রমেক্রমে অপব্যয়ের আধিক্য প্রযুক্ত ক্রোরপতিকেও ঋণগ্রস্ত হইতে হইবেই হইবে। ঋণের যন্ত্রণা কি ঘোর যন্ত্রণা যিনি ঋণগ্রস্ত নহেন, তিনি হয়ত বুঝিতে পারিবেন না। সর্ব্বগ্রাসিনী ঋণ দেবতা সমস্ত আয়কে উদরস্থ করিয়াও গৃহস্থকে নিষ্কৃতি দেয় না, আর একবার ঐ দেবতার আবির্ভাব হইলে সহজে বা শীঘ্র পরিবারের পরিত্রাণের সম্ভাবনা থাকে না। সকলেরই কর্ত্তব্য ঋণের সহায়তা পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন অল্প আয়ে বৃহৎ পরিবার তবে কি করিয়া চলিবে? ইহার উত্তরে আমি বলিতেছি কথঞ্চিৎ ক্লেশস্বীকার ও কথঞ্চিৎ সুখানুভব অগ্রাহ্য করাই একমাত্র উপায়। দুর্ভিক্ষব্যতীত অনাহারে মনুষ্য মরিবার কথা নহে। দুই বার আহার করিতে করিতে একবার আহার করিতে হইলে মনুষ্য হঠাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় না, আমাদের দেশের বিধবারা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আর দুঃখ করিয়া পরিণামে সচ্ছল হইয়াছে অর্থাৎ দুঃখী পরিবার অনাটন জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। সংসারে কি বিচিত্র নিয়ম—দুঃখের পর সুখ অনাটনের পর সচ্ছলতা! হয়ত কেহ বলিবেন তাই বলিয়া হরকান্তের পুত্র সন্দেশ খাইবে আর আমার বাছা উহা খাইতে পাইবে না? মাতা পিতার অন্তঃকরণে বাৎসল্যহেতু এইরূপ আক্ষেপের উদয় হইতে পারে সত্য, দুঃখীর পুত্র ও পরিবারের ক্লেশে কাহার না চক্ষে জল আইসে? বিশেষতঃ যখন সম্মুখে একটী ধনীর পুত্র ভাল আহারীয় সামগ্রী ভক্ষণ করিতে থাকে আর দরিদ্রসন্তান তাহার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, সে দৃশ্য দেখিয়া কোন্ হৃদয় না কাতর হয়? মাতা পিতার উক্ত প্রকার হৃদয়বেদনা সত্ত্বেও ঋণগ্রস্ত হওয়া বা অপব্যয় করা কোন মতেই বিধেয় নহে। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে মিষ্টান্নে বঞ্চিত করিয়াও যদি সন্তানকে ঋণগ্রস্ত না রাখিয়া যান, তাহাহইলে সন্তানের পক্ষে মহা কল্যাণ করিয়া গেলেন। কিন্তু অনুকরণ দোষে দূষিত হইয়া যদি সন্তানগণকে ঋণী করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাদের একপ্রকার সর্ব্বনাশ করিয়া যাইবেন।

এই অনুকরণ দোষ রমণীমণ্ডলীতে অত্যন্ত প্রশ্রয় পায়। রমণীরাই এই

দোষে অধিক লিপ্ত ও রমণীপ্রকৃতি পুরুষেরও ঐ দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষের এ দোষ যত হউক না, যদি গৃহিণী ঐ দোষে পরিলিপ্ত না হয়েন, তাহা হইলে গৃহস্থের তাদৃশ অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু গৃহিণী ঐ দোষে দোষী হইলে সে সংসারের আর রক্ষা নাই।

ঋণগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে বলিলাম, যাহা "নহিলে নয়" তাহার জন্য কথন কথন অনেককেই ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। দশ টাকা ব্যয় করিয়া বালকের সুন্দর পোষাক করিয়া দেওয়া, ১০০ টাকা খরচ করিয়া ঘড়ীর চেন ক্রয় করা, অথবা ভার্য্যার রূপ উন্নতি করিবার জন্য ২।৪ শত মুদ্রা ব্যয় করাকে "নহিলে নয়" ব্যয় বলা যায় না। ভরণ পোষণ ইত্যাদির জন্য যে ব্যয়, তাহাকেই 'নহিলে নয়'—ব্যয় কহে।" দায়ে পড়িলে যে ব্যয়, তাহার নাম নহিলে নয় ব্যয়, আত্মীয় পরিবারের পীড়া শান্তির জন্য যে ব্যয়, তাহাকে ন্যায্য ব্যয়-বলে—সন্তানগণের ভাবী শ্রীবৃদ্ধির আশায় যে ব্যয়, তাহাকেও নহিলে-নয় ব্যয় বলা যায়। এইরূপ কতকগুলি ব্যয় হেতু কাহাকেও ঋণগ্রস্ত হইতে হইলে কি করা উচিত ভাবিয়া দেখা যাউক। (১) ঋণের প্রতি তাঁহার আশঙ্কা ও ঘৃণা রাখা উচিত, (২) ঋণ পরিশোধ করা উচিত। প্রথম ভাব না থাকিলে আবার ঋণ করিতে ইচ্ছা জন্মে,—সামান্য কারণে ঋণ করিয়া ফেলিতে হয়। দ্বিতীয় ভাব না থাকিলে মানুষকে ধর্ম্মে পতিত, মানভ্রষ্ট, হয় ত সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

ঋণ-পরিশোধ করিতে হইলে সঞ্চয় আবশ্যক—সামান্য আয় হইতে ব্যয় করিয়াও সঞ্চয় করিতে হয়। যে কারণ বশতঃ ঋণ করিতে হইয়াছে, সেই কারণের অভাব প্রযুক্ত বা তাহার পরিবর্ত্তন হেতু সঞ্চয়ের উপায় হইবামাত্রই সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। এক দিনে সম্পত্তিশালী হওয়া অসম্ভব না হউক, অতি বিরল বলিতে হইবে। প্রতিদিনের সঞ্চয়ে মাসের সঞ্চয়, মাসের সঞ্চয়ে বৎসরের সঞ্চয়, বৎসরের সঞ্চয়ে জীবনের সঞ্চয়। সমস্ত জীবনে সঙ্গতিশালী হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যাঁহারা আয়ের প্রথম দিবস হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। যাঁহারা উপায় সত্বেও মনে করেন, আজি সঞ্চয় হইল না, কালি হইবে—এই রূপে প্রত্যেক 'কালির' আশায় থাকেন, তাঁহারা কথনই সঞ্চয় করিতে পারেন না। সঞ্চয়ের নিয়ম আছে—সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া সঞ্চয় করিতে হয়। যাহা নহিলে-নয়, তাহা ব্যতীত ব্যয় না করাই সেই নিয়ম অবলম্বন। প্রত্যেক ব্যক্তির এই নিয়ম অবলম্বন করা বিধেয়—বিশেষতঃ যিনি ঋণগ্রস্ত আছেন, তাঁহার পক্ষে ইহা আশু শুভফলপ্রদ।

যখন আয় হইতে ব্যয় অল্প থাকে, তখন যেমন সঞ্চয় করিবার সুযোগ থাকে, তেমনই অপব্যয় করিবার বাসনাও প্রবল হইতে পারে। তখন মনে হয় অদৃষ্ট ভবিষ্যে না জানি কত আয় সঞ্চিত আছে! আয় হ্রাস পাইতে পারে বা ব্যয় বৃদ্ধি হইতে পারে, এ ভাব মনোমধ্যে আইসে না। আসিলেও তখন আশার মোহিনী শক্তি উহা দূর করিয়া দেয়। যাহাদের এই আশা বলবতী, তাহারাই সাধারণতঃ অকুলান হেতু পরিণামে কষ্ট পাইয়া থাকে। ভবিষ্যতের উপর যখন কাহারও আধিপত্য নাই—তখন উহাতে নির্ভর করা সম্পূর্ণ নির্ব্বুদ্ধিতা বলিতে হইবে। ভবিষ্যতে ভাল হইতে পারে—ভাল হউক ভাল কথা—তাই বলিয়া ভাল হইবেই হইবে এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ নহে। সুতরাং ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া বর্ত্তমানে যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে পারাযায়, তাহা অপব্যয়ে নষ্ট করা কেবল নিবুর্দ্ধিতা নয় দুর্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য।

(ক্রমশঃ)

দার্জ্জিলিং ভ্রমণ।*

দার্জ্জিলিঙ্গের নাম বামাবোধিনীর পাঠিকারা সকলেই শুনিয়াছেন। এই সুরম্য পার্ব্বত্য নগরের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া অল্প পরিমাণেও তাহা অপরের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারি, আমার এমন সাধ্য নাই। বিশেষতঃ যেরূপ চক্ষু এবং যেরূপ হৃদয় লইয়া বিধাতার বর্ণনাতীত রচনা কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, আমার চক্ষু সৌন্দর্য্যানুভবে তদ্রূপ শিক্ষিত বা হৃদয় সেই সৌন্দর্য্য সম্যক উপভোগ করিবার পক্ষে তদনুরূপ উন্নত হয় নাই। সুতরাং দার্জ্জিলিঙ্গের সৌন্দর্য্যের অতি অল্পই আমি নিজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি!

ভারতবর্ষের মানচিত্রের শিরোভাগে হিমাচল নামে যে মহান্ পর্ব্বতপ্রাচীর পূর্ব্বহইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়, উহার এক ক্ষুদ্র অংশে দার্জ্জিলিং সংস্থাপিত। হিমাচল পর্ব্বতকে হিন্দু কবিগণ নগাধিরাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও হিমালয় পর্ব্বতদিগের রাজা। ইহার ন্যায় প্রকাণ্ড পর্ব্বত পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থ ২০০ মাইল। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর অথবা এবারেষ্ট সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২৯০০২ ফিট উচ্চ। এবারেষ্ট নামক জনৈক ইয়োরোপীয় সর্ব্বপ্রথম এই শৃঙ্গের উচ্চতা নির্ণয় করেন বলিয়া তাঁহারই নামানুসারে ইয়োরোপীয়গণ ইহাকে অভিহিত করেন। উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থানীয় এবং দার্জ্জিলিঙ্গের

* বঙ্গমহিলা সমাজের কুমারী কামিনী সেন বি এর পঠিত হিমাচল ভ্রমণ ৭ প্রস্তাব হইতে গৃহীত।

এক প্রধান আকর্ষণ কাঞ্চন জুঞ্জা। কাঞ্চন জুঞ্জা অর্থ পঞ্চ হিমাধার। ইহার উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২৮১৭৬ ফিট। এবারেষ্ট নেপালের উত্তর সীমায় এবং কাঞ্চন জুঞ্জা নেপালের পূর্ব্ব সীমায় ও সিকিমের উত্তর পশ্চিম সীমায় অবস্থিত।

দার্জ্জিলিঙ্গের উত্তরে সিকিম রাজ্য। বড়রঙ্গীত, ত্রিস্রোতা বা তিস্তা এবং রম্মে নামক তিনটি নদী দার্জ্জিলিংকে সিকিম রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। দার্জ্জিলিঙ্গের দক্ষিণে পূর্ণিয়া ও রঙ্গপুর; কিঞ্চিৎ দক্ষিণপূর্ব্বে রাজসাহী ও কুচবিহার। পূর্ব্বদিকে ডেচি ও নেচি নামক দুইটী নদী ইহাকে ভূটান হইতে পৃথক্ করিতেছে। পশ্চিমে মেচি নামক নদী ও একটী পর্ব্বত শ্রেণী ইহাকে নেপাল হইতে পৃথক্ করিতেছে। দার্জ্জিলিঙ্গের সাধারণ উচ্চতা ৭০০০ ফিট, উচ্চতা বশতঃই ইহার এত শৈত্য। কলিকাতায় যখন দারুণ গ্রীষ্ম, দার্জ্জিলিঙ্গে তখনও বেশ শীত বোধ হয়।

পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং সিকিমের অন্তর্ভূত ছিল। এককালে নেপালী গুরুখাগণ সিকিমের কিয়দংশ অধিকার করিয়া ক্রমে ব্রিটিষ রাজ্য আক্রমণ করে। ইংরাজগণ ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া হিমালয় প্রদেশের কিয়দংশ ইহাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক নৈনিতাল, মশুরি এবং সিমলা প্রভৃতি স্থান স্বাস্থ্যবিহার স্থানরূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন; এবং মোরাঙ্গ নামক বর্ত্তমান দার্জ্জিলিং প্রদেশের দক্ষিণ ভাগ সিকিমপতিকে প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহার এগার বৎসর পরে দুইজন ইংরাজ কর্ম্মচারী নেপাল ও সিকিম রাজ্যদ্বয়ের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া দার্জ্জিলিঙ্গের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চোঁচাঙ্গ নামক স্থান পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আইসেন। দার্জ্জিলিং দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল যে এই স্থান স্বাস্থ্যোন্নতির সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে, অতএব এই স্থানে ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপন করিলেই ভাল হয়। তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিককে আপনাদের মন্তব্য জ্ঞাপন করিলেন। ১৮৩০ খৃঃঅব্দে জনৈক ইংরাজ আমিন সিকিম রাজ্য পরিদর্শন করিতে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার রিপোর্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রেরিত হইল। ডিরেক্টরদিগের অনুমত্যনুসারে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট সিকিমরাজের নিকট হইতে দার্জ্জিলিং প্রদেশ স্বাস্থ্য বিধায়ক স্থান এবং সেনানিবেশরূপে ব্যবহার করিবার জন্য চাহিয়া লইলেন; এবং তদ্বিনিময়ে সিকিমপতিকে বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কাচমূল্যে মণি বিক্রীত হইল! এপ্রিল হইতে

অক্টোবর পর্যান্ত স্বাস্থ্য লাভার্থ এবং আমোদার্থ অনেকানেক ইংরাজপুরুষ ও রমণী এস্থানে সমাগত হন। বঙ্গের শাসন কর্ত্তা অর্থাৎ ছোটলাট বাহাদুর গ্রীষ্মকালে এই স্থানে বিহার করেন। দার্জ্জিলিং সহরের নিকটে এবং দূরে প্রায় তিন পার্শ্বেই অসংখ্য চা-বাগান। এক একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ে এক একটী বাগান এবং চা-করের সুদৃশ্য বাড়ী,আর তাহারই কিয়দ্দূরে কুলিদিগের বস্তি অথবা কুটীরময় ক্ষুদ্র গ্রাম। দার্জ্জিলিঙ্গে দাড়াইয়া এই চা-বাগানগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কুলি গ্রামের এক এক খানি কুটীর খোলা ঘরের এক এক-খানি খোলার ন্যায় দেখায়। চাকর-দিগের যেমন পশার, তেমনই আবার সুখ। দুঃখী বাঙ্গালীরা অর্থাভাবে এমন সুন্দর স্থান দর্শন করিয়া নয়ন মনের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারেন না, আর যাহাদের অর্থের সচ্ছলতা আছে,তাঁহা-দের অনেকের রুচি অন্যরূপ।

আমরা অপরাহ্নে ২—২০ মিনিটের সময় কলিকাতা ত্যাগ করি। রেলওয়ে পথের কথা কিছুই বলিবার নাই। রেল পথের সুখ দুঃখ সকলেই জানেন। যে পথ দিয়া আমরা দার্জ্জিলিং গিয়াছি, তাহার অর্দ্ধাধিক পথ সচরাচর সকলেই গিয়া থাকেন। তবে পথে আমাদের একটী দৃশ্য বড়ই সুন্দর লাগিয়াছিল, এখনও তাহা ভুলিতে পারি নাই; সেই জন্যই একবার তাহার উল্লেখ করিতেছি। আমি পূর্ব্বে দামুকদিয়া ষ্টেসনে অনেক বার নামিয়াছি, কিন্তু একবারও দামুক-দিয়াতে কোনদিকে চক্ষু আকৃষ্ট হয় নাই; কোন মতে গাড়ী হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠিয়াছি। যখন পদ্মা জলে পরিপূর্ণ থাকে, তখন গাড়ী ষ্টেসনের নিকটে থামে; কিন্তু যে সময় নদীর জল কমিয়া নদীপার্শ্ব অনেক দূর পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়, তখন সেই শুষ্ক বালুকাময় ভূমির উপরে রেল পাতিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার উপর দিয়া গাড়ী জাহাজ ঘাটের নিকটে আইসে। এবার রেলের দুই পার্শ্বস্থ বালুকারাশি জ্যোৎস্নালোকে এমন সুন্দর দেখাইতেছিল যে আমরা দেখিয়া দেখিয়া আর চক্ষু ফিরাইতে পারি নাই—;ঠিক বোধ হইতেছিল যেন আমরা শুভ্রফেণ অচঞ্চল জল রাশির মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছি আপনারা কোন দিন চন্দ্রালোকে বালু-কার উপর দিয়া যদি যান, তাহা হইলে উহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবেন। জাহাজে নদীপার হইয়া আমরা সারা-ঘাটে আসিলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম গাড়ীগুলি বড় ছোট। পর দিন প্রত্যূষে আমার পূর্ব্বপরিচিত জল-পাইগুড়ি পৌছিলাম। এখান হইতে একঘণ্টা পরে শিলিগুড়ি আসিলাম। শিলিগুড়ি আসিয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। শিলিগুড়ি হইতে যে ট্রেণ দার্জ্জিলিং যায়, তাহার গাড়ীগুলি

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। শিলিগুড়ি হইতে যাইতে যাইতেই মনে হইতে লাগিল, যেন ক্রমে ক্রমে উচ্চে উঠিতেছি। আর কিয়দ্দূরে আসিবামাত্রই পর্ব্বতশ্রেণী তরঙ্গায়িত দিগন্ত প্রসারিণী মেঘমালার মত সম্মুখস্থ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে লাগিল; ক্রমেই মেঘায়মান পর্ব্বতদেহ স্পষ্টতর হইয়া আসিল। অতঃপর পর্ব্বত দেহস্থ বৃক্ষ রাজি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এদিকে রেলপথের এক পার্শ্ব নিম্নতর এবং অপর পার্শ্ব প্রাচীরের ন্যায় কিম্বা তদপেক্ষা অধিক উচ্চতর বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে দেখি সম্মুখে এবং পার্শ্বে পাহাড়ের পর পাহাড়! একবার যে স্থান অতি উচ্চ বলিয়া মনে হইয়াছে, দণ্ড দুই পরে সে স্থান কত নিম্নে পড়িয়া রহিতেছে। পার্ব্বত্য পথগুলি বক্রাকার, সেই পথে গাড়ীগুলি একবার দক্ষিণে একবার বামে বৃত্তার্দ্ধের মত বাঁকিয়া চলিতেছিল। কখন বা যে পথ দিয়া একবার চলিয়া আসিয়াছি, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই পথেরই পার্শ্বস্থ উন্নত ভূমির উপর দিয়া আসিতেছি, কখন বা দশ পাঁচ মিনিট পরে ঠিক সেই পথের উপরিস্থ সেতু দিয়া আসিতেছি। পার্ব্বত্যপথ ও গাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে একটি কথা মনে হইল; ইহা আমি কোথাও পড়িয়াছি, কি ইহা আমার নিজের মানসপ্রসূত চিন্তা, তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু তখন আপনা আপনি মনে হইল যে এই পথের সঙ্গে আমাদের জীবন পথের কত সৌসাদৃশ্য, উভয়েরই উদ্দেশ্য ক্রমোন্নতি লাভ। উন্নত লক্ষ্য গুলি কত নিকট এবং সহজ প্রাপ্য বলিয়া বোধ হয়, অথচ উহার নিকট যাইবার পথ কত দীর্ঘ, যাইতে কত বিলম্ব হয়। যাঁহারা উন্নততর প্রদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, নিজের ও তাঁহাদের মধ্যস্থ দূরত্ব কত অল্প বোধ হয় অথচ তাঁহাদের নিকটস্থ হইতে কত সময় ও কত আয়াসের প্রয়োজন!

(ক্রমশঃ)

সংযুক্তা হরণ।

চতুর্থ সর্গ।

(২৫৯ সংখ্যা ১১০ পৃষ্ঠার পর)

আজ্ঞা দিয়া নিজ মঞ্চে বসিলা নরেশ,
সংযুক্তা সভা মণ্ডপে করিলা প্রবেশ।
অগ্রে কুলাচার্য্যা, পিছে জল ধারা দিয়া
চলিলা মিলিয়া সখী, থাকিয়া থাকিয়া,
বাজায় মোহন শঙ্খ, মন্থর গমনে
উত্তরিলা অগ্রবর্ত্তী, মঞ্চ নিকেতনে।
সুরভি-বাহক সুশীতল সমীরণ,
বনে বনে ফুলে ফুলে করে বিচরণ :—

সহসা কুসুম কুঞ্জে রোধে যদি গতি,
ঈষৎ প্রবল ভাবে প্রবাহে যেমতি,
দোলয় পল্লব বৃন্ত, কাঁপে ফুল দল,
শিহরে লতিকা দাম ক্ষরে পরিমল!
শিহরিল নৃপ-সুত বিহ্বল পুলকে
উজলিয়া মঞ্চ দিব্য লাবণ্য ঝলকে,
বিলাস বপন নেত্র সুধা পানে স্থির,
স্পন্দে হৃদি, নাচে প্রাণ, স্বেদার্দ্র শরীর।
সসম্ভ্রমে রাজভট্ট যুড়ি দুই কর,
গাইল কুলজী গীত শ্রুতিসুখকর;—
"বীর শ্রেষ্ঠ শূরসেন গান্ধারাধীশ্বর,
কৌরবের মাতামহ-কুল-বংশধর,
যেমন মোহন রূপ, বিক্রম তেমন,
বয়সে নবীন কিন্তু যুদ্ধে বিচক্ষণ।
বিশাল গান্ধার রাজ্য রমণীয় স্থান,
ভুবনে অলকানিভ, আনন্দ উদ্যান,
নন্দন-নিন্দিত শোভা অমর-বাঞ্ছিত,
সুধাময় ফল ভারে সদা সুসজ্জিত,
নানা ফল বৃক্ষ যথা, প্রকৃতি কৃপায়
চিরদিন জনগণে অমৃত বিলায়!
লোভেতে বিহ্বল হয়ে বিকল অন্তরে
ভুবনের যত পাখী মিলে বাস করে;
সঙ্গীতে পূরিত দেশ, বহে সুধাধার,
দ্যু-লোকে অমরাবতী, ভূলোকে গান্ধার!
এ হেন রাজ্যের স্বামী বীরেন্দ্র সুন্দর,
কনৌজনন্দিনি হের বাঞ্ছি তব কর,
রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য সমস্ত করি পণ,
তব ধ্যান ধারণায় নিরত রাজন।
জলধিগামিনী নদী ফিরে কি কখন
সরসীর ক্ষোভ স্বরে উচ্ছ্বাস জীবন,
দোলায়ে তরঙ্গ মালা, অর্ণব উরসে
রঙ্গভরে অঙ্গ ঢালে, সঙ্গম লালসে!
সম্মানিয়া শূরসেনে বিনতবদনে,
পদাঙ্গুলি অগ্রভাগ নিরখে নয়নে,
বিভোর চকোর আর ফিরে কি কোথায়?
সাধে পদ নখে কবি চাঁদেরে খেদায়?
ইঙ্গিতে চলিল কুলাচার্য্য অগ্রসরি,
সখীসহ নৃত্যভাবে মিলিয়া সুন্দরী
চলিলা, মরাল যথা মদালস ভরে
সরসীর উপকূলে বুলে কেলি করে!
ক্রমে ছাড়াইলা মঞ্চ, সুমেরু এড়িয়া
উদয় গগণে রবি, পুরোদেশ দিয়া
প্রবাহে বিপুল বিভা, পরশি ছায়ায়
মলিন সুমেরু মুখ ঝাঁপে তমসায়!
ছায়ায় ছাইল মঞ্চ, অন্ধ অক্ষিদ্বয়,
নিরাশায় নৃপসুত মৃত কল্প রয়।
উজলিল পুরোমঞ্চ,—অরুণ সংকাশে
উজলে রক্তিমা রাগ পূরব আকাশে,—
আশায় উন্নত আঁখি, স্ফীত বক্ষস্থল,
অনিমেষে নৃপসুত হেরিয়া বিহ্বল!
গাইল কুলজী ভট্ট, "কনৌজ নন্দিনি,
প্রসিদ্ধ পুরুষ পুর—যাহার কাহিনী
বিদিত বৌদ্ধ জগতে রমণীয় স্থান,
ভারতের উপপ্রান্তে চির অধিষ্ঠান।
চির স্বাস্থ্যকর দেশ, নাহি রোগ শোক,
সুখ ভোগে কান্তিপুষ্ট যথাকার লোক,
যেমন সুন্দর বপু, বীর জনোচিত,
তেমনি আয়ত বক্ষ সদা বীর্য্য স্ফীত,
সকলে সাহসী, ভীরু ধরমে কেবল,
ধরায় অমরাবতী—অদ্বিতীয় স্থল।
এই ধর্ম্মধ্বজ রাজা ভূপতি তাহার
রূপে গুণে পরাক্রমে, দ্বিতীয় কুমার,

পরিণয় সূত্রে, তব, লালসি বন্ধন
ধন জন, রাজ্য পদ করেন অর্পণ।
চলিলেন কুলাচার্য্য ইঙ্গিত পাইয়া
ঘন ঘটা হতে ছটা সহসা ভাতিয়া,
ক্ষণে আঁধারিল আঁখি, নিরাশে মরমে
স্পন্দহীন নৃপসুত পীড়িত মরমে।"
বন্দি ধর্ম্মধ্বজে বালা, গজেন্দ্র গমনে
চলিলেন পর মঞ্চে।—

ভারতে পাশ্চাত্য রাজা।

(গতবারের পর)

খৃষ্টীয় শাকের ৩২৮ বৎসর পূর্ব্বে আলেকজান্দার (সেকন্দার সাহ) নামে সুবিখ্যাত গ্রীক রাজা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তিনি সিন্ধু নদের তটস্থ আটক নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় নদ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অপ্রশস্ত বলিয়া সসৈন্যে সহজে পার হইতে পারিলেন। টাকসাইলিস (তক্ষশীলেস) নামে ভারতবর্ষীয় রাজা আলেকজান্দারের শরণাপন্ন হইলেন; কিন্তু পোরস (পুরু) নামে মহা তেজস্বী নরপতি আলেকজান্দারের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ পোরসের অধীনস্থ সৈন্যেরা রাজপুত, ও পর্ব্বতবাসী লোক ছিল। হাইড্যাসপিস্ বা বিতস্তা নদীর তীরে পোরসের সহিত আলেকজান্দারের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে পোরস আপনার বীরত্বের পরিচয় দিয়া অবশেষে বন্দী হইলেন। আলেকজান্দার পোরসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব?" পোরস বলিলেন "রাজার ন্যায়।" ইহাতে দিগ্বিজয়ী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন ও পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। হাইড্যাসপিস নদী ত্যাগ করিয়া আলেকজান্দার হাইফেসিস বা শতদ্রু নদীর তটে উপনীত হইলেন। সিন্ধু নদের যে পঞ্চ শাখা আছে, তন্মধ্যে শতদ্রু সকলের পশ্চাতে অবস্থিত। আলেকজান্দারের নিতান্ত অভিলাষ ছিল ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত আসেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যেরা কোন ক্রমেই অগ্রসর হইতে চাহিল না, সুতরাং রাজাকেও প্রত্যাগমন করিতে হইল। আসিয়া মহাদেশের অন্তঃপাতী পারস্য দেশ, বাবিলন, টায়র ও গাজা ইত্যাদি দেশ সকল আলেকজান্দার জয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাবিলন তাঁহার আসিয়াস্থ অধিকারের রাজধানী হয়। হাইড্যাসপিস নদীর তীরে আলেকজান্দার অত্যুত্তম নৌ নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ পাইয়া তদ্দ্বারা দুই সহস্র প্রকাণ্ড জলযান নির্ম্মাণ করাইলেন, তাঁহার সৈন্যের মধ্যে যাহারা ফিনিসিয়া ও অন্যান্য বাণিজ্য-প্রিয় দেশের নিবাসী ছিল, তাহাদিগকে তিনি নৌ-নির্ম্মাণের ভার-